আত্মতত্ত্ব প্রকাশ

অর্থাৎ

জীবাত্মার অস্তিত্ব, নিত্যত্ব, জন্মান্তর-
পরিগ্রহ ও মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে
ন্যায় দর্শনের মত এবং
ভাবতীয় দর্শন সমূ-
হের সংক্ষিপ্ত
ইতিবৃত্ত।

কৃষ্ণনগর কলেজেব ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এবং
গবর্ণমেণ্টের সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

১/১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৭ খৃঃ।

মূল্য ॥০ মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মদীয় পূজ্যপাদ গুরু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কলেজে যখন আমি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি তখন অন্যান্য দর্শনের তুলনায় ন্যায়দর্শনের অখণ্ডনীয় যুক্তি পরম্পরা সন্দর্শনে বঙ্গভাষায় ন্যায়দর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখার বাসনা আমার হৃদয়ে সমুদিত হয়। পরে আমি নব্যভারত, জন্মভূমি প্রভৃতি মাসিক পত্রে দর্শন-শাস্ত্রসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কতিপয় প্রবন্ধ লিখি। ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সার্ব্বভৌম, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বাচস্পতি এবং কৃষ্ণনগরের ভূতপুর্ব্ব ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল ও কৃষ্ণনগর নিবাসী আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য আমাকে উৎ-সাহিত করেন। সংপ্রতি আমি তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে উহার কয়েকটী প্রবন্ধ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া "আত্মতত্ত্ব প্রকাশ" নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত করিলাম। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ভূতপুর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ ও টাকীর সুশিক্ষিত ভূম্যধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয়দ্বয় এই পুস্তকে হিন্দুদর্শনের মতের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদার্শনিকগণের মত উদ্ধৃত করিতে উপদেশ দিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ সমীচীন হইলেও আপাততঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন দর্শনের মত উদ্ধৃত না হওয়ায় ঐ সকল মত সঙ্কলিত হইল না।

উদীয়মান বঙ্গভাষায় দিন দিন বহুসংখ্যক নাটক ও উপন্যাস উৎপত্তিলাভ করিতেছে বটে কিন্তু ইহাতে দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত পুস্তক অতি অল্পই রচিত

হইতেছে। একে সাধারণ সমাজে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত বিরল বিশেষতঃ সংস্কৃত দর্শনে এমন কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে যাহা এপর্য্যন্ত বঙ্গীয় অভিধানে পরিগৃহীত হয় নাই সুতরাং ইহা যে দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য। এই পুস্তক যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয় তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যদি যুক্তিসন্ধিৎসুমহোদয়গণ ইহা পাঠ করিয়া পরিতোষ লাভ করেন তাহা হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ন্যায়দর্শনের যে সকল পুস্তক অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত হইল তাহার অধিকাংশ কৃষ্ণনগর কলেজ লাইব্রেরী ও এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে সংগৃহীত। বৌদ্ধদর্শনের মতসমূহ শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি,আই,ই মহোদয় কর্ত্তৃক তিব্বত ও সিংহল হইতে আনীত ও বুদ্ধিষ্ট টেক্স্টবুক্ সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসকল হইতে সমাহৃত হইল।

পরিশেষে সবিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তকের প্রকাশ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এসিয়াটিক্ সোসাইটী
কলিকাতা,
১৮৯৭ খ্রীঃ ১০ই মার্চ্চ।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

সূচীপত্র।

ভারতীয় দর্শনসমূহের ইতিবৃত্ত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

আত্মতত্ত্ব প্রকাশ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভারতীয় দর্শনসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

দর্শন সমূহের উৎপত্তি ও পৌর্ব্বাপর্য্য।

দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতীত বুদ্ধিশক্তি পরিমার্জ্জিত হয় না। যে সময়ে বেদের উপনিষদ্‌ভাগ বিরচিত হয় তাহাই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তির আদিম কাল। বৈদিকযুগে সকলেই বেদোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কেহই কোন আপত্তি করিতেন না। কালক্রমে এমন কতকগুলি মনীষী জন্মগ্রহণ করিলেন যাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা যুক্তি ব্যতীত চিরাচরিত নিয়মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল না। তাঁহারা ঈশ্বর, পরলোক, জন্ম, মরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা বিতর্ক উপস্থিত করিলেন, কালক্রমে উহাই দর্শনশাস্ত্রের বীজরূপে পরিণত হইল। দর্শনশাস্ত্রের সংখ্যা ছয়টী; (১) যথা, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, পাতঞ্জল ও বেদান্ত। এই দর্শনশাস্ত্রসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে অনেকে বলেন সাংখ্য দর্শনই সর্ব্ব প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই দর্শনের আবিষ্কর্ত্তা মহর্ষি কপিল। বেদে তাঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২)। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে তিনি আদি জ্ঞানী বলিয়া

---

(১) কেহ কেহ চার্ব্বাকদর্শন স্বীকার করেন। চার্ব্বাক কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে; যাঁহারা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যতীত পরলোক স্বীকার করেন না তাঁহারাই চার্ব্বাক। মহর্ষি বৃহস্পতি এই সম্প্রদায়ের আদি গুরু।

(২) শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ হইতে সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক কপিল সম্বন্ধে যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা লিখিত

বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার পরই ন্যায়দর্শনের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ন্যায়সূত্রের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম। তাহার পরই বৈশেষিক দর্শন উৎপন্ন হইয়াছিল। বৈশেষিক দর্শনের সর্ব্বপ্রথম রচয়িতা মহর্ষি কণাদ। তাহার পর মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা ও মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শন এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু মদীয় অন্যতম গুরু সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের টীকায় যুক্তিসহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কপিলের সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরমর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক, আসুরি তাঁহা হইতে উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, পঞ্চশিখ আসুরির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া উহা প্রচার করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ শিষ্যপরম্পরায় সমাগত সাংখ্যজ্ঞানলাভ করিয়া উহা আর্য্যাচ্ছন্দে গ্রন্থাকারে পরিণত করেন।

হইল। শঙ্কর লিখিয়াছেন :—"শ্রুতিশ্চভবতি, ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)।" এই ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি যে টীকা করিয়াছেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—যস্তাবদগ্রে সর্গাদৌ জায়মানং কপিলনামানাং ঋষিং স্থিতিকালে চ প্রসূতং ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানার্থজ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি তমীশ্বরং পশ্যেদিতি যোজনা। যোগিপ্রত্যক্ষ মূলতয়া সাংখ্যস্মৃতীনাং শ্রুত্যনপেক্ষত্বাত্তদ্বিরোধেহপি নাপ্রামাণ্যমিতি ফলিতমাহ।

তদনন্তর বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রণয়ন করিয়া সাংখ্যদর্শনপ্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। অধুনা সাংখ্যদর্শন বিষয়ে যে সকল মূলগ্রন্থ বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ইদানীং সাংখ্যসূত্র নামে যে গ্রন্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় (বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যনামে যাহার ভাষ্য রচনা করেন এবং অনিরুদ্ধ যাহার টীকা করিয়াছেন) অনেকের মতে উহা প্রকৃত কপিলকৃত সাংখ্যসূত্র নহে, বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী হইতে সঙ্কলিত। সাংখ্যদর্শনের মত সমূহ মহাভারত রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা, ভাগবত পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের যে সকল মত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন "যেমন বহুসংখ্যক মল্লের মধ্যে প্রধান মল্লকে পরাজিত করিতে পারিলে অপর মল্লেরা পরাজিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয় সেইরূপ যখন আমি সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডন করিয়াছি অতএব অন্যান্য দর্শনের মতসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"

ন্যায়দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক বিরচিত হইল।

ন্যায়সূত্রপ্রণেতা গৌতমের জন্মভূমি।

কতকাল হইল ভূমণ্ডলে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। ন্যায়সূত্রপ্রণেতা গৌতম কে? কোন্ দেশ বা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা কে? তিনি সংসারী বা সংসারত্যাগী ছিলেন এ সকল বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। বায়ু পুরাণে কথিত হই-

আছে যে মহর্ষি গৌতম শ্বেতবরাহকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্মীকি রামায়ণে এক গৌতমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তিনি অহল্যার স্বামী, তাঁহারই অভিসম্পাতে দেবরাজ সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহোদয় টোল রিপোর্টে সারন্‌জেলার অন্তর্গত রেভেলগঞ্জের নিকট গট্‌না গ্রামে গৌতম টম্‌সন্ পাঠশালার উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও মতে ঐ স্থানই ন্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতমের জন্মভূমি। কেহ বলেন মগধ হইতে মিথিলা যাইবার পথে বক্‌সরনগরীর সন্নিহিত ভাগীরথী তীরে গৌতমের আশ্রম ছিল। অন্যেরা বলেন দরভঙ্গা নগরী হইতে সীতামারী অভিমুখে যে রেলপথ গিয়াছে, তাহারই সন্নিকটে গৌতমের আশ্রম ছিল। উহারই অনতিদূরে একখণ্ড পাষাণ পতিত রহিয়াছে, লোকে বলে এই স্থান গৌতমের আশ্রম এবং ঐ প্রস্তরখণ্ডই অহল্যার পাষাণদেহ। ইহা দরভঙ্গা নগরী হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কোণে।

মিথিলা প্রদেশে গৌতমের জন্ম ও ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা।

পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মিথিলায় যে প্রকার ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা, তাহাতে মিথিলাই যে ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমের জন্মভূমি ইহা অনেক পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য। দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য মিথিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচারে প্রথম পরাজয় লাভ করেন (১)। গৌতমসূত্রভাষ্য-প্রণেতা পক্ষিল স্বামী (বাৎসায়ন), তত্ত্বচিন্তামণিরচয়িতা গঙ্গেশ

---

(১) শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে পরিশেষে শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

উপাধ্যায়, ন্যায়পদার্থমালার লেখক পক্ষধরমিশ্র, কিরণাবলী-প্রকাশের লেখক বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টীকা প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থকার মিথিলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপের পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা হইতে ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রচারবৃদ্ধি করেন। পরে নবদ্বীপনিবাসী জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথতর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ এই শাস্ত্রের বহুল উন্নতিসাধন করেন। নবদ্বীপের আদিনৈয়ায়িক কে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়দর্শনসংক্রান্ত কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, কুসুমাঞ্জলির অন্যতম ব্যাখ্যাকার রামভদ্র সিদ্ধান্ত বাগীশই নবদ্বীপের আদিনৈয়ায়িক। তদনন্তর বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথশিরোমণি, ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ জন্মগ্রহণ করেন।

ন্যায়দর্শনের গ্রন্থসমূহ।

মহর্ষি গৌতম যে সূত্র প্রণয়ন করেন পক্ষিলস্বামী তাহার সর্ব্ব প্রথম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তদনন্তর উদ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি যথাক্রমে ন্যায়সূত্রের বার্ত্তিক, বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টীকা, বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি ইত্যাদি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন জয়ন্ত, বিশ্বনাথ প্রভৃতি কৃত ন্যায়সূত্রের বৃত্তি বর্ত্তমান আছে। আর রামকৃষ্ণকৃত তর্কচন্দ্রিকা, উদয়নাচার্য্য কৃত দ্রব্যপ্রকাশ, কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ববিবেক এবং কুসুমাঞ্জলি, রঘুদেব

ভট্টাচার্য্য কৃত দ্রব্যসারসংগ্রহ, মহাদেবপণ্ডিতকৃত ন্যায়কৌস্তুভ, বল্লভপণ্ডিত কৃত ন্যায়লীলাবতী, অনন্তভট্টকৃত পদার্থচন্দ্রিকা, ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যকৃত (১) ন্যায়বিন্দুটীকা ইত্যাদি বহুসংখ্যক গ্রন্থের দ্বারা ন্যায়দর্শনের পুষ্টিসাধন হইয়াছে।

ন্যায়ভাষ্যপ্রণেতা পক্ষিলস্বামীর আবির্ভাব কাল ও দিঙ্‌নাগের বৃত্তান্ত।

ন্যায়ভাষ্যপ্রণেতা পক্ষিলস্বামী কোন্ সময়ের লোক তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারা যায় না। জৈন হেমচন্দ্র স্বীয় অভিধানে পক্ষিলস্বামী ও চাণক্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্য প্রণেতা পক্ষিলস্বামী ও চাণক্য একব্যক্তি হইলে তিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন ইহা একরূপ নিশ্চিত। বাচস্পতি মিশ্র স্বীয় ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায় লিখিয়াছেন "ভগবান্ পক্ষিলস্বামী ন্যায়সূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, দিঙ্‌নাগাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধপণ্ডিতগণের কুতর্কদ্বারা উহা সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, উহার উদ্ধারের নিমিত্ত উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিক লিখিয়াছেন ও আমি ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা প্রণয়ন করিলাম।" কালিদাস মেঘদূত কাব্যে দিঙ্‌নাগকে নিজের কাব্যের নিন্দক বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন ইহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্রদাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় তিব্বতীয় গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া আমাকে বলিয়াছেন দিঙ্‌নাগাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীনগরের সন্নিহিত সিংহবক্ত্র

(১) ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়া ন্যায় বিন্দু টীকা রচিত হইয়াছে।

গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নাগদত্তের সম্প্রদায় ভুক্ত হন। তিনি বসুবন্ধুর (১) শিষ্য। এক সময়ে তিনি উৎকলের সমুদয় দার্শনিককে পরাস্ত করিয়া তর্ক পুঙ্গব উপাধি লাভ করেন। তাঁহার কৃত প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতের পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে।

ন্যায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত মত ও উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গক্রমে ন্যায়দর্শনপ্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। মহর্ষি গোতম ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্ আত্মা ও মন এই সকল দ্রব্যের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া বিশ্ব সংসারের রচনা কৌশল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা চতুর্দ্দিকে চেতন বা অচেতন যে সকল পদার্থ অনুভব করিতেছি উহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ ও বিয়োগে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম কাল ও দিক্ ইত্যাদির পরস্পর সংযোগে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। জড় জগতের সহিত জীবাত্মার সংযোগে বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ভাবনা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই নয়প্রকার গুণের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ভূমণ্ডলে উৎপত্তি লাভ করতঃ উল্লিখিত গুণ সমূহে সমাকৃষ্ট হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যে মুহূর্ত্তে আমরা বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিরন্তর সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতেছি। যেহেতু সংসার দুঃখবহুল এবং ইহাতে যে কিঞ্চিৎ সুখ আছে তাহাও যখন

(১) বসুবন্ধু ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

দুঃখমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে সুতরাং নিরন্তর দুঃখভোগ করাই জন্মগ্রহণের চরমফল। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে জড় জগতের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ না ঘটে এবং দুঃখের একান্ত উচ্ছেদ হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই ন্যায় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা কিরূপে দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত ধ্বংস এবং আত্মার চিরনির্বৃতিলাভ হয় তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ সাংখ্যদর্শনের মত অবলম্বন করিয়া ন্যায়দর্শন বিরচিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ মহর্ষি গৌতম কপিলের মত অবলম্বন করিয়াই স্বীয় দর্শন প্রণয়ন করেন (১)। কপিল বলেন প্রকৃতি (জড়জগৎ) ও পুরুষের (জীবাত্মার) পরস্পর সম্বন্ধে যথাক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে মহৎ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র ও বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট জীবাত্মা, পঞ্চভূত এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মন এই ষড়িন্দ্রিয় স্বীকার করিয়া জগতের রচনা কৌশল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধিকন্তু মহামুনি কপিল পরমাত্মা কাল ও দিক্ নামক যে পদার্থত্রয়ের বিচার করিয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিহার করিয়াছিলেন, গৌতম সেই তিনটী পদার্থও স্বীয় দর্শনে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

---

(১) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ মহাশয়ের মতে সাংখ্য দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া ন্যায় দর্শন লিখিত হয় নাই। কপিল এক প্রকৃতি হইতে বিশ্বের আবির্ভাব প্রমাণ করিয়াছেন কিন্তু গৌতম বিশ্বকে খণ্ড খণ্ডরূপে বিশ্লেষণ করতঃ অসংখ্য পরমাণু পুঞ্জে উপনীত করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যমুনি ও কপিলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয়মত প্রচার করেন। বৌদ্ধ-দর্শন প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ;—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। ইহার মধ্যে মাধ্যমিক দর্শন সমধিক প্রাচীন। খৃঃ পূঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত প্রজ্ঞাপারমিতা নামক গ্রন্থে মাধ্যমিক দর্শনের মত যেরূপ সুস্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় ঐ মত বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদর্ভদেশীয় আর্য্যনাগার্জ্জুন নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক এই দর্শনের মতসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া মাধ্যমিকসূত্র প্রণয়ন করেন। চন্দ্রকীর্ত্তি তাহার বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন নাগার্জ্জুন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১) বিদর্ভদেশে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্ঞা পারমিতা টীকা প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। বোধি-চর্য্যাবতারগ্রন্থ প্রণেতা শান্তিপ্রভ লিখিয়াছেন "দর্শনশাস্ত্রের সূত্রসমূহ সকলেরই অবলোকন করা উচিত বিশেষতঃ আর্য্য-নাগার্জ্জুনকৃত সূত্রসমুচ্চয় অতিশয় যত্নসহকারে অধ্যয়নকরা কর্ত্তব্য"(২)। প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ

বৌদ্ধদর্শনের কাল নির্দ্দেশ।

---

(১) কাহারও মতে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে, অন্যের মতে খ্রীঃ পর ১ম শতাব্দীতে।

(২) সংক্ষেপেণাথবা তাবৎ পশ্যেৎ সূত্রসমুচ্চয়ম্।
আর্য্যনাগার্জ্জুনাবদ্ধং দ্বিতীয়ঞ্চ প্রযত্নতঃ॥ (বোধিচর্য্যাবতার)

আলোকিত হইয়াছে আর্য্যনাগার্জ্জুন তাঁহাদিগের অন্ততম।" কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে নাগার্জ্জুন নামক কোন বৌদ্ধ নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি আরাম বিহার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মাধ্যমিক সূত্র প্রণেতা নাগার্জ্জুন ও কাশ্মীরাধিপতি, এক কিনা তাহা নিশ্চয় জানিতে পারা যায় না। মাধ্যমিকসূত্রের বৃত্তিকার চন্দ্রকীর্ত্তি খৃষ্টের পরবর্ত্তী ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক।

বৌদ্ধেরা রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পঞ্চ স্কন্ধ ব্যতীত অপর কোন পদার্থ স্বীকার করেন না। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্‌ ও মন এই ষড়িন্দ্রিয় এই একাদশ পদার্থই রূপস্কন্ধ নামে অভিহিত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যথাসম্ভব সম্বন্ধ হইলে বেদনা স্কন্ধের (বুদ্ধির) উৎপত্তি হয়, তদনন্তর অহং এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে, অহং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নামরূপ ইত্যাদির যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলে। এই অহং জ্ঞান ও নামরূপ ইত্যাদির জ্ঞানসমূহ হইতে সংস্কার স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চ প্রকারে বিবর্ত্তমান জ্ঞান সমূহই আত্মা। বৌদ্ধেরা কার্য্য কারণের ভেদ স্বীকার করেন না।

মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণের মত।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা কোন পদার্থেরই স্বভাব (যথার্থসত্তা) অঙ্গীকার করেন না, পদার্থসমূহের প্রতীয়মানসত্ত্বা মাত্র (একের সত্ত্বায় অপরের সত্তা ও একের অভাবে অন্যের অভাব যথা - চক্ষুর সত্ত্বায় রূপের সত্তা ও চক্ষুর অভাবে রূপের অভাব রূপের অভাবে চক্ষুর অভাব) স্বীকার করিয়া থাকেন। পরমার্থতঃ তাঁহারা জড় ও

চৈতন্য কোন পদার্থই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিশ্বসংসার শূন্যতার বিবর্ত্ত এবং বিশ্বের পরিণাম শূন্যতা, পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়া মাত্র, আমাদের অবিদ্যার (অজ্ঞানের) নাশ হইলেই জগৎ শূন্যতায় পরিণত হইবে। যোগাবলম্বন পূর্ব্বক এই অসীম, অনাদি, অতি গম্ভীর, শান্তির নিকেতন, মহাসাম্যের আশ্রয় এবং বাক্য ও মনের অগোচর শূন্যতা ভাবনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগী শূন্যতায় লীন হইবেন ও তাঁহার নির্ব্বাণলাভ হইবে, তাঁহাকে আর সংসারতাপে সন্তপ্ত হইতে হইবে না। যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বটে কিন্তু জ্ঞানের যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে জ্ঞানসমূহ ক্ষণিক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের জ্ঞানসমূহ পর পর মুহূর্ত্তে সংক্রান্ত হইয়া যে অবিচ্ছন্ন প্রবাহ উৎপন্ন করে তাহাই আত্মা বা আমি। সৌত্রান্তিকেরা জ্ঞানস্বীকার করেন এবং বলেন যদিও আমরা বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ তথাপি জ্ঞানদ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। বৈভাষিকেরা বাহ্যার্থ ও জ্ঞান উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনের ছায়া অবলম্বন করিয়াই যে বৌদ্ধদর্শন রচিত হইয়াছে পদে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ বৈশেষিক ও বৌদ্ধদর্শন ন্যায়দর্শনের পরবর্ত্তী।

অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে অনুমান হয় বৌদ্ধদর্শন ও বৈশেষিকদর্শন ন্যায়দর্শনের পরে রচিত হইয়াছিল। মহর্ষি গোতমই পরমাণুবাদের স্রষ্টা। জড়পদার্থসমূহ যে পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত ইহা প্রথমে তিনিই আবিষ্কার করেন। মহর্ষি কণাদ

পরমাণুবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতের বিশেষত্ব এই যে তিনি পরমাণু সমূহের পরস্পর ভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত পরমাণুনিষ্ঠ এক একটী বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন। এইজন্য তাঁহার দর্শন বৈশেষিক নামে অভিহিত। আর তিনি, মহর্ষি গৌতমের স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ এই চারি প্রমাণের মধ্যে নিষ্প্রয়োজন বোধে উপমান ও শাব্দ এই দুইটী প্রমাণ পরিহার করিয়াছেন।

বোধ হয় বৌদ্ধদিগের ক্ষণবিজ্ঞানবাদ গৌতমের পরমাণুবাদের অনুকরণ মাত্র। মহর্ষি গৌতম বলেন জড়পদার্থসমূহ অতি অল্প-স্থানব্যাপী। যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বলেন জ্ঞানসমূহ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী।

মীমাংসাদর্শন এবং জৈমিনি, শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট।

মীমাংসা দর্শনপ্রণেতা মহর্ষিজৈমিনি শাক্যমুনির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অনেকের ধারণা। কথিত আছে জৈমিনি প্রথমে আপনাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরিচয় দিয়া কোন বৌদ্ধগুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, একদা গুরুমুখে নিরীশ্বরবাদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুপাত হইতেছিল, তাহাতে বৌদ্ধেরা তাঁহাকে কপট বিবেচনায় নিষ্কাশিত করিয়া দেন। তিনি সেখান হইতে গমন করিলেন এবং বৌদ্ধেরা যে বেদের বিরোধী তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে মীমাংসাদর্শন রচনা করিলেন। কিন্তু তিনি গুরুর নিকট যে নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহার হৃদয় হইতে তাহা তিরোহিত হইল না সুতরাং তাঁহার কৃত মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয়

নাই। জৈমিনি স্বীয় মীমাংসাসূত্রে যজ্ঞবিষয়ে আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিসমূহের মীমাংসা করিয়াছেন। তদনন্তর শবরস্বামী মীমাংসাভাষ্যে ও কুমারিল ভট্ট (১) মীমাংসাবার্ত্তিকে অনেক দার্শনিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। ভট্টপাদ, গুরুপাদ, প্রভাকর প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই দর্শনের অনেক জটিল তত্ত্বের সমাধান করিয়াছেন। প্রবাদ আছে শবরস্বামীর প্রকৃত নাম আদিত্যদাস। ইনি বৌদ্ধ ভয়ে শবরগণের মধ্যে ছদ্মবেশে বাস করিয়াছিলেন তজ্জন্য ইহার নাম শবরস্বামী হয়। কথিত আছে ইনি উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পিতা (২)। এই মত কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারা যায় না।

পতঞ্জলি ও যোগদর্শন।

পাণিনির ভাষ্যকার ও যোগদর্শনপ্রণেতা পতঞ্জলি এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারা যায় না। তবে ভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন ইহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। যোগদর্শন প্রণেতা পতঞ্জলি সকল বিষয়েই সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষ

---

(১) কুমারিলভট্ট কোন্ সময়ের লোক তাহার নিশ্চয় প্রমাণ নাই তবে তাঁহার মীমাংসাবার্ত্তিকে "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ" কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হওয়ায় তিনি কালিদাসের পরবর্ত্তী ইহা অনুমান করা যায়।

(২) ব্রাহ্মণ্যামভবদ্বরাহমিহিরো জ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ
রাজা ভর্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ।
বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্র বৈদ্যতিলকো জাতশ্চশঙ্কুঃকৃতী
শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ ॥

(পুরুষপরীক্ষা টীকা)

এই যে, কপিল ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই কিন্তু পতঞ্জলি পর-মাত্মা স্বীকার করিয়া যোগদ্বারা কিরূপে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লয় করা যায় তাহার প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন, বৌধায়ন ভাষ্য এবং অদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের যথার্থ প্রণেতা কে তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। মূলসূত্রে বাদরি, বাদরায়ণ ও জৈমিনির নাম এবং মত উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকেই বলেন ইহা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচিত সুতরাং ইহাদ্বারা বাদরায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। মূলসূত্রে যোগ-দর্শন, ক্ষণিকবাদ, শূন্যবাদ ইত্যাদি সমুদয় দর্শনের মত উল্লিখিত হওয়ায় ইহা যে সকল দর্শনের পরে বিরচিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ব্রহ্মসূত্র প্রণেতার প্রকৃত মনের ভাব কি তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুসারে ইহা হইতে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের বৌধায়নকৃত ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রামানুজ স্বকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যায় নিজ মত সংস্থাপনের নিমিত্ত বৌধায়নের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাধ্যমিক দর্শনের মত ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ।

মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের (১) বৌদ্ধদিগের সহিত শঙ্করাচার্য্যের মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মাধ্যমিকেরা যেমন পারমার্থিক ও সাম্বৃতিক এই দুই অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য ও সেই প্রকার পার-

(১) মাধ্যমিক (মহাযান) সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদিগের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রজ্ঞা-পারমিতা। উক্তগ্রন্থে অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

মার্থিক ও ব্যবহারিক এই দুই অবস্থা স্বীকার করেন। মাধ্যমিকদিগের মতে মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা ও জগৎ শূন্যতায় পরিণত হয় (১)। শঙ্করাচার্য্যের মতে জীবাত্মা ও জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়। শঙ্করাচার্য্য যাহাকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলেন বৌদ্ধেরা তাহাকে শূন্য (২) বলেন। উভয়মতেই মুক্তাবস্থায় অবিদ্যার ধ্বংস হয়। বেদান্তিগণের মতে "আমি ব্রহ্ম" এইজ্ঞান জন্মিলে মুক্তিলাভ হয়, মাধ্যমিকগণের মতে "আমি শূন্যতামাত্র" এই জ্ঞান দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয়। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহপ্রণেতা মাধবাচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে পদ্মপুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত (৩)। কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় বলেন "ঐ বচন শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী

অবিদ্যা—যথা সারিপুত্র ন সংবিদ্যন্তে তথা সংবিদ্যন্তে এবমবিদ্যমানাস্তেনোচ্যন্তে অবিদ্যেতি।

মায়া—ধর্ম্মতৈষা সুভূতে ধর্ম্মাণাং মায়াধর্ম্মতামুপাদায় স্যাৎ।

যথাপি নামসুভূতে দক্ষোমায়াকরো বা মায়াকরান্তেবাসী বা
চতুর্থমহাপথে মহান্তং জনকায়মভিনির্ম্মিমীতে।
অভিনির্ম্মায় তস্যৈব মহতো জনকায়স্য অন্তর্ধানং কুর্য্যাৎ।
তৎ কিং মন্যসে সুভূতে অপি নু তত্র কেনচিৎ কশ্চিৎ হতো বা
নাশিতো বা অন্তর্হিতো বা।

(১) শূন্যতাগতিকা হি সুভূতে সর্ব্বধর্ম্মাস্তে তাং গতিং ন ব্যতিবর্ত্তন্তে (প্রজ্ঞাপারমিতা)।

(২) গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্।
শূন্যতায়া এতদধিবচনমপ্রমেয়মিতি।
যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে।
যা চ শূন্যতা অপ্রমেয়তাপি সা। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

(৩) মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।।
(পদ্মপুরাণ)

মায়াবাদের প্রতি কটাক্ষ মাত্র। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে মায়াবাদ প্রাচীন বেদান্তে স্থান পায় নাই নতুবা তিনি প্রবচনভাষ্যে (১) "ইদানীং যাঁহারা আপনাদিগকে বেদান্তী বলিয়া অভিমান করেন তাঁহাদিগের মত মন্তব্য নহে" এ কথা বলিবেন কেন?"

অনেকের মতে রামানুজ স্বামীই বৈষ্ণবদর্শনের প্রবর্ত্তক।

মহাত্মা চৈতন্য ও বৈষ্ণব দর্শন।

১৪৮৪ খৃঃ নবদ্বীপে মহাত্মা চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও মধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি অবলম্বনে যে নূতন মত প্রচার করেন উহা দ্বারা বৈষ্ণবদর্শনের বহুল উন্নতি হইয়াছে। মহাত্মা চৈতন্য দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তিনি ভক্তি মত প্রচার করেন। বৈষ্ণবগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দময়(প্রেমময়) ভাবের উপাসক। ইঁহারা বৈদান্তিকগণের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন না, ঈশ্বর ও জীবের সহিত উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করেন। জীব ঈশ্বরের সহিত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে। ভগবানের অসীম ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব্বভাবের উদয় হয় তাহার নাম শান্ত ভাব। ঈশ্বর প্রভু আমরা দাস আমাদের হৃদয়ে ক্রমে এইরূপ ভাবের যে উদয় হয় তাহাকে দাস্যভাব বলে। এইরূপ ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতে যখন আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ পরিচিত মনে করি সেই সময় সখ্যভাবের উদয় হয়। এই পরিচয় ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হইলে সেবক মনে করেন ঈশ্বর তাঁহার

---

(১) ইদানীন্তনানাং বেদান্তিব্রুবাণাং মতং ন বাচ্যম্।
(সাংখ্য প্রবচনভাষ্য)

প্রতি গাঢ়তর স্নেহ করিতেছেন এইরূপ ভাবের নাম বাৎসল্য ভাব। ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে পতিপত্নী সম্বন্ধ তাহার নাম মধুর ভাব। এই ভাবই উপাসকগণের সবিশেষ অভীপ্সিত।

ঈশ্বরে ভক্তিবশতঃ আমরা তাঁহার যে তন্ময় ভাব প্রাপ্ত হই তাহাই মুক্তি। এতদতিরিক্ত অন্য কোন মুক্তি নাই। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, যোগ ও বেদান্ত দর্শনসমূহ একবাক্যে স্বীকার করেন সংসার দুঃখ বহুল, এই তাপকসংসার পরিত্যাগ করাই পরম পুরুষার্থ। মহাত্মা চৈতন্যের মতে জন্ম জন্মান্তর লাভ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করাই পরম পুরুষার্থ। জন্মের একান্ত উচ্ছেদ ও প্রেমময় সংসারের চিরপরিত্যাগ বৈষ্ণবগণের অভীপ্সিত নহে। প্রাচীন দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে নির্গুণ (১) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বৈষ্ণবগণের মতে ঈশ্বর সগুণ। (২)

পাশ্চাত্য দর্শনের মত।

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ কোন স্বতন্ত্র নিত্য জীবাত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন রূপকর্তৃক চাক্ষুষ স্নায়ু অভিহত হইলে ঐ স্নায়ুর মধ্যস্থিত স্বচ্ছ তরলপদার্থের কম্পন হয় এবং উহার

---

(১) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্,
নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ (কঠোপনিষৎ)

(২) নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি
র্ব্রজেন্দ্র কুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা নিকর নীবিবন্ধার্গল
চ্ছিদাকরণ কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

মধ্যে এক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্ক কেন্দ্র বা মস্তকের স্নায়ুকে আঘাত করতঃ দর্শন প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দদ্বারা যথাক্রমে জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও কর্ণের স্নায়ু অভিহত হইলে ঐরূপে রাসন, ঘ্রাণজ, স্পার্শন ও শ্রাবণ প্রত্যক্ষ জন্মে। ক্রমে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইতে সবিকল্প জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই মতে মানব একটী স্নায়বিক যন্ত্র মাত্র। বাহ্যজগতের শক্তিরদ্বারা এই অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র পরিচালিত হয়। গতি স্থিতি, অনুভূতি ইত্যাদি এই যন্ত্রের কার্য্য (১)। স্নায়বিক উত্তেজনা কিরূপে জ্ঞানে পরিণত হইল তাহার সুমীমাংসা ইহারা করিতে পারেন নাই (২)। কোন কোন য়ুরোপীয় দার্শনিক জ্ঞানসমূহ স্বীকার করেন বটে কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় আত্মা স্বীকার করেন না। স্থির আত্মা স্বীকার না করিলে স্মরণ প্রত্যাশা প্রত্যভিজ্ঞা ইত্যাদি অসম্ভব হইয়া পড়ে (৩)।

---

(১) "According to this school man is a machine, no doubt the most complex and wonderfully adapted of all known machines, but still neither more nor less than an instrument whose energy is provided by force from without, and which when set in action, performs the various operations for which its structure fits it, namely to live, move, feel and think."

(২) "This doctrine is known as that of human automatism, the doctrine that we are essentialiy nervous machines with a useless appendage of consciousness somehow added. The doctrine obviously fails to explain why consciousness should appear on the scene at all." James Sully.

(৩) If, therefore, we speak of the mind as a series of

হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা জন্মান্তর স্বীকার করেন না। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল সুতরাং জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষের লোকের আবিষ্কৃত মত বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদিও খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পিথাগোরস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ গ্রীস্‌দেশে এই মত প্রচার করেন কিন্তু তাঁহারা উহা উদ্ভাবন করেন নাই। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সি,এচ্ টনি,এম্, এ,সি, আই, ই, মহোদয় প্রমাণ করিয়াছেন যে পিথাগোরস্ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় পিথাগোরস্ ভারতবর্ষ হইতেই উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে মীসরবাসিগণও জন্মান্তর স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহারা হিন্দু বা গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহাই অনেকের ধারণা। ভারতবর্ষে কোন্ ঋষি কোন্ সময়ে এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন তাহা জানিবার উপায় নাই।

ভারতে জন্মান্তরবাদ।

কোন কোন য়ুরোপীয় দার্শনিক এবং স্বর্গীয় ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এল্-এল্-ডি, মহোদয় বলেন যে কোন নিরীশ্বরবাদী কর্ত্তৃক জন্মান্তরবাদ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল পর পর জন্মের সুখ দুঃখের কারণ

জন্মান্তরবাদ নিরীশ্বরবাদী কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এরূপ আশঙ্কা।

of feelings we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future ; and we are reduced to the alterative of believing that the mind or ego, is something different from any series of feelings, or possibilities of them, or of accepting the paradox, that something which *ex hypotheisi* is but a series of feelings can be aware of itself as a series." John Stuart Mill.

হয় তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথম জন্ম বা কর্ম্মফল নির্ণয় করা যাইতে পারে না। এই জন্য দার্শনিকগণ সংসারকে অনাদি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আদ্যন্তরহিত সংসারের স্রষ্টা কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। যেমন কুসুমনিচয় কালান্তরে স্বয়ংই ফলরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ আমরা ইহজন্মে বা অতীত জন্মে যে পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি উহা আত্মায় সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকিয়া কালান্তরে স্বয়ংই আত্মগ্লানি বা আত্মপ্রসাদরূপে পরিণত হয়। এই আত্মগ্লানি বা আত্মপ্রসাদ বশতঃ আমরা রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন বিপদ ভোগ করি ও দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা পরোপকার প্রভৃতিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকি। আমরা বন্ধুনাশ ও সুহৃৎপ্রাপ্তি ইত্যাদিজনিত যে সকল দুঃখ বা সুখ অনুভব করি তাহাও ঐ পাপ বা পুণ্যকর্ম্মের চরম ফল। যেমন এক পদার্থ স্বয়ংই কালসহকারে কলিকা পুষ্প ও ফলরূপ ধারণ করে সেইরূপ আমাদের ইহজন্মের ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমূহ আত্মায় সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ংই বিভিন্নপ্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব জন্মান্তর স্বীকার করিলে ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

উক্ত আশঙ্কায় নিরাস।

নিরীশ্বরবাদী কর্ত্তৃক যে জন্মান্তরবাদ সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয় একথা অযৌক্তিক। কারণ যে ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি ঈশ্বরের কথা আছে আবার তাহাতেই জন্মান্তরবাদ ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আমাদের সুখ দুঃখের উপাদান কারণ বটে কিন্তু ঈশ্বর উহার নিমিত্ত কারণ। যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, কুম্ভকার উহার নিমিত্ত

কারণ। আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতেছি বটে কিন্তু ঐ সুখ দুঃখের নিয়ন্তা কে? অতএব অবশ্য বলিতে হইবে ঈশ্বরই আমাদের সুখ দুঃখের সহিত সংযুক্ত করিতেছেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন, "জন্মান্তর থাকুক বা না থাকুক জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র এইরূপ বৈষম্য হইল কেন? ইহার কারণ ব্যাখাস্থলে ভারতীয় ঋষিগণ জন্মান্তর স্বীকার করিয়া যে অসীম প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ভূমণ্ডলে কোন দেশের কোন মনীষীই তদ্রূপ বিচারশক্তি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই।"

ভারতীয় মুক্তিতত্ত্ব।

মুক্তি সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থান করেন ইহা ভারতীয় দার্শনিকগণের মত। কপিল বলেন জীবাত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব। সংসারাবস্থায় দেহের সহিত জীবাত্মার যে অনির্ব্বচনীয় বন্ধন থাকে তাহার একান্ত উচ্ছেদ হইলেই তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হন। *

---

* স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংযোগে সমুৎপন্ন প্রাণীর যে প্রণালীতে বুদ্ধির বিকাশ হয় কপিল সেই প্রণালী পরিদর্শন পূর্ব্বক সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের সংযোগে যে জীবের উৎপত্তি হয় প্রথমে তাহার এক প্রকার অস্ফুট বোধ জন্মে তাহাকে বুদ্ধি বলে। ঐ অবস্থায় আপন পর ইত্যাদি কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না। তদনন্তর ঐ বুদ্ধি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলে নিজের সত্তা ও নিজের সহিত বাহ্য জগতের পার্থক্য অনুভব করিতে থাকে। বুদ্ধির পরিপক্ক অবস্থায় অহঙ্কার (অহংজ্ঞান) জন্মে। তদনন্তর সে ক্রমে বুঝিতে থাকে তাহার চক্ষুদ্বারা সে রূপ দেখিতেছে ও কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনিতেছে। এই রূপে সে

গৌতম বলেন দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেই জীবাত্মা সুখ দুঃখ রহিত হইয়া নির্গুণভাব প্রাপ্ত হন। বৈদান্তিক বলেন মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন ও সচ্চিদানন্দ ভাব প্রাপ্ত হন। কোন কোন মীমাংসক বলেন মুক্তাবস্থায় আত্মা নিত্য

একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়ের সহিত আপনাকে সংবদ্ধ বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলেই জীবের নিজের সত্তার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে ইহাকেই জন্ম বলে।

মৃত্যুকালে ঐ জীবের চক্ষু রূপ দেখিতে পায় না ও কর্ণ শব্দ শুনিতে পায় না। এইরূপে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সম্বন্ধের সম্পূর্ণ অভাব হইলে 'আমি আছি' 'আমি দেখিতেছি' ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কার (অহংজ্ঞান) বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন এক প্রকার অস্ফুট বুদ্ধি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে সে আমি তুমি কিছুই ভেদ করিতে পারে না। এই বুদ্ধির লোপ হইলে ঐ জীবের মৃত্যু হয়।

মহর্ষি কপিল জীবের এই জন্ম ও মৃত্যু ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাঁহার মতে অনুভূয়মান রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের সমষ্টিই ব্যক্ত জগৎ। চক্ষু কর্ণাদির সহিত সন্নিকর্ষ ঘটিবার পূর্ব্বে ও রূপ শব্দ ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল কিন্তু উহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অতীত ছিল। আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্ব্বে যে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ বিদ্যমান ছিল উহাই অব্যক্ত জগৎ বা প্রকৃতি। আমরা যে জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি উহা ঐ অব্যক্ত জগৎ বা প্রকৃতির প্রতিবিম্ব মাত্র।

পুরুষ (জীবাত্মা) নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। ইনি অনাদি ও অনন্ত। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ঘট পট ইত্যাদি যে প্রকার জ্ঞান আছে তাঁহার তাহা নাই, আমি তুমি ইত্যাদি কোন প্রকার জ্ঞানই তাঁহাতে বিদ্যমান নাই।

অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির (অব্যক্ত জগৎ) সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ঘটিলে প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধি) ভাব প্রাপ্ত হন। আমরা জল মধ্যে যখন কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব

সুখ সাক্ষাৎকারলাভ করেন। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বলেন মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা শূন্যতায় লীন হন। বৈষ্ণবগণ বলেন জীবাত্মা মুক্তিক্ষণে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ ও তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হন। মুক্তাবস্থায় দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত ধ্বংস হয় ইহা সকল

দেখিতে পাই তখন মনে করি ঐ বস্তুর ঐ প্রকার বিকৃতি জন্মিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহার কোন বিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের নিকট যে ভাবে প্রতীয়মান হইলেন তাহাই মহৎ (বুদ্ধি), ইহাতে প্রকৃতির যে যথার্থ কোন বিবর্ত্তন ঘটিল তাহা নহে কিন্তু পুরুষের নিকট ঐরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইলেন। তদনন্তর ঐ বুদ্ধি ক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইল ও প্রকৃতি পুরুষের নিকট আমি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। পুরুষের নিকট ঐ প্রকৃতি এক প্রকার অস্ফুট অহংভাবে প্রতীত হইলেন, ইহাই অহঙ্কার তত্ত্ব। তদনন্তর প্রকৃতি একদাশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়রূপে প্রতীয়মান হইলেন। আমি চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিতেছি কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনিতেছি এইরূপ ভাবে অহঙ্কারের পূর্ণ বিকাশ হইল। এই অবস্থায় প্রকৃতি পুরুষের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত হইলেন, পুরুষ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়ের সত্তা অনুভব করিলেন। ব্যক্ত জগতের সহিত পুরুষ এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন; ইহাই পুরুষের সংসারাবস্থা।

যে অবস্থায় পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ব্যাবৃত্ত করিতে সমর্থ হন তাহাই মুক্তিপথের প্রথম সোপান। তখন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ থাকে না বটে কিন্তু—এই অসীম অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের মধ্যে "আমি আছি" এই প্রকার পুরুষের অস্ফুট অহঙ্কার থাকিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ঐ অহঙ্কারের লোপ হইলে "আমি আছি" বলিয়া কোন জ্ঞান থাকে না বটে কিন্তু এক প্রকার অস্ফুট বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে, ঐ বুদ্ধির লোপ হইলেই জগৎ আমাদের জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইয়া পড়ে এবং ব্যক্ত জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। ব্যক্ত জগতের লয় হইলে পুরুষ মুক্ত হন, তখন তাঁহার "আমি তুমি" ইত্যাদি কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না।

মতান্তরই অভিপ্রেত। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি, মুক্তির এই চারি উপায়।

ঈশ্বর।

শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এক দেব আছেন, তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা ও ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা (১)। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, মুক্তির অন্য উপায় নাই (২)। মহর্ষি গৌতম ও কণাদ বলেন কার্য্যমাত্রেরই একজন কর্ত্তা আছেন, এই পৃথিবীরূপ-কার্য্যের যিনি কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর (৩)। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যোগদ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলেন যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের আবির্ভাব হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর (৪)। যিনি যেরূপ বিতর্কই করুন না কেন আমরা বলি "হে ঈশ্বর! এবম্বিধ শ্রুতি ও যুক্তি পরম্পরারূপ বারিরাশিদ্বারা ভূয়োভূয়ঃ প্রক্ষালিত যাঁহাদের হৃদয়ে তুমি স্থান প্রাপ্ত না হও সেই সকল মানব যথার্থই পাষাণ-হৃদয়; কিন্তু হে কারুণিক! তোমার প্রতি যাহারা প্রতিকূলাচারী তুমিই তাহাদিগকে তোমার প্রতি নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত কর ও কৃপা করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে পরিত্রাণ কর (৫)।"

---

(১) দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ইতি শ্রুতিঃ।

(২) তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(৩) ইয়ং ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যাদ্যনুমানেন ঈশ্বরসিদ্ধিরিতি গৌতমকণাদৌ।

(৪) জন্মাদ্যস্য যতঃ ইতি ব্যাসঃ। (ব্রহ্মসূত্রম্)।

(৫) ইত্যেবং শ্রুতিনীতিসংপ্লবজলৈর্ভূয়োভিরাক্ষালিতে
যেষাং নাস্পদমাদধাসি হৃদয়ে তে শৈলসারাশয়াঃ।
কিন্তু প্রস্তুতবিপ্রতীপবিধয়োঽপ্যুচ্চৈর্ভবচ্চিন্তকাঃ
কালে কারুণিক! ত্বয়ৈব কৃপয়া তে তারণীয়া নরাঃ॥

কুসুমাঞ্জলিঃ।

আত্মতত্ত্ব প্রকাশ।

প্রথম অধ্যায়।

জীবাত্মার অস্তিত্ব।

জগৎ ও আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের বিতর্ক।

আত্মা কি পদার্থ? এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অতি পুরাকাল হইতে বহু তর্ক বিতর্ক করিয়া আসিতেছেন। এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যৎসামান্য স্থানের ও অনাদি অনন্ত মহাকাল মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সময়ের ঘটনামালা ভৌতিকশরীরের সাহায্যে অনুভব করিয়া কেহ কেহ মনে ভাবেন "আমার এই আদি এই অন্ত আমি ইহার পূর্ব্বে কোথায়ও ছিলাম না ও ইহার পরে কোথায়ও থাকিব না, অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া অকারণে কিঞ্চিৎ দুঃখভোগ করিয়া লীলাসংবরণ করিলাম।" কেহ কেহ বা জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বিলোকন করিয়া মনে ভাবেন, "এই মুহূর্ত্তে আমি বিদ্যমান আছি, ইহার পর মুহূর্ত্তে আমি বর্ত্তমান থাকিবনা। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই প্রথম ক্ষণে উদয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে বিলয় হইতেছে।" চিরকাল এইরূপ বহু লোক বহু প্রকার তর্ক করিয়া আসিতেছেন।

আত্মা কি ? এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত মনীষিগণ যুগযুগান্ত হইতে জগতের প্রত্যেক জড়বস্তুর তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলেন, কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে সুচারু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, কখনও বা জগতের সমুদয় জড়বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সমাধিমগ্ন হইলেন, তাহাতেও আত্মার সম্যক্ সন্ধান পাইলেন না। কেহ কেহ ভাবিলেন "জগতে কেবল জড়পদার্থই বিদ্যমান আছে, চৈতন্য জড়পদার্থেরই ক্রিয়াবিশেষ, জড়াতিরিক্ত চৈতন্যপদার্থ নাই।" (১) কেহ কেহ বা ভাবিলেন "কেবল চৈতন্য পদার্থই বিদ্যমান আছে, ঘটপটাদি চৈতন্যেরই আকার বিশেষ, চৈতন্যাতিরিক্ত জড়পদার্থ নাই। (২) কেহ কেহ

---

(১) চার্ব্বাক দর্শনকার।

(২) বেদান্ত ও যোগাচার দর্শনকার। যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন আমরা যে সকল পদার্থকে ঘট পট ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকি উহারা জ্ঞানেরই বিকাশমাত্র। ঘট এই জ্ঞানের বাহিরে ঘট নামক কোন স্বতন্ত্র জড় পদার্থ নাই। তাঁহাদের মতে ক্ষণিকজ্ঞানসমূহই আত্মা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান পরপর জ্ঞানে সংক্রান্ত হইয়া যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ উৎপন্ন করে তাহাই আত্মা বা আমি। জ্ঞানসমূহ ধারাবাহিক বলিয়া, যে আমি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিদ্যমান ছিলাম, সেই আমি এই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান আছি এরূপ প্রত্যভিজ্ঞার অভাব হয় না। যেমন ধারাবাহিক জলকণাসমূহ মিলিত হইয়া নদী নাম ধারণ করে, ঐ জলকণাসমূহ ব্যতীত নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই সেইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে সংক্রমণশীল জ্ঞানসমূহই আত্মা ঐ জ্ঞানসমূহব্যতীত আত্মা নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। উক্ত মতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে একটী গল্প উদ্ধৃত হইতেছে :—

৭২০ খ্রীঃ অব্দে তিব্বতদেশে মিসরঙ্গ ডিউসন্ নামক কোন নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় অত্যন্ত সন্তরণপ্রিয় ছিলেন। একদা উক্ত

বা ভাবিলেন "চৈতন্তের উপাদান জড়পদার্থ হইতে পারে না এবং জড়বস্তুও চৈতন্তের আকারবিশেষ হইতে পারে না, জগতে জড় ও চৈতন্ত উভয় পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এই জড় ও চৈতন্তের সংযোগেই জীবজগতের উৎপত্তি হইতেছে।" (১) কেহ কেহ বা ভাবিলেন জড়পদার্থও বিদ্যমান

রাজপুত্র কোন মন্ত্রীর তত্বাবধানে সাংপো নদীতে সন্তরণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অল্প জলে সাঁতার দিতেছেন ইত্যবসরে তরঙ্গের আঘাতে আবর্ত্তমধ্যে নিমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রী রাজকুমারের মৃতদেহ নৃপতির নিকট প্রদান করিলে তিনি মন্ত্রী ও তদীয় অনুচরগণের উপর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। মন্ত্রী ও অনুচরগণ সমবেত হইয়া এই প্রার্থনা জানাইল যে তাহাদের কোন দোষ নাই, নদীই যুবরাজকে নিহত করিয়াছে এবং নৃপতি যখন জল স্থল ও স্বর্গের অদ্বিতীয় অধীশ্বর তখন ন্যায়তঃ সাংপো নদীকেই শাস্তি প্রদান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তদনুসারে নৃপতি আদেশ করিলেন যে যেখানে কুমার নিমগ্ন হইয়াছিলেন তথায় প্রতিদিন যেন পঞ্চশত বেত্রাঘাত করা হয়। আদেশ অনুসারে কার্য্যকরা হইল এবং নদীকে প্রতিদিন পঞ্চশত বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। এক দিন নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্যায় দণ্ড সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যের দেহ ধারণ করতঃ নরপতির নিকটে তাঁহার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিলেন এবং তথ্যানুসন্ধানের জন্য নৃপতিকে স্বয়ং তথায় যাইতে প্রার্থনা করিলেন। নরপতি নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইলে যুবরাজ যেখানে জলমগ্ন হইয়াছিলেন ব্রহ্মার পুত্র তথায় এক তরণী স্থাপন করিলেন, তরণীখানি তৎক্ষণাৎ তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন নরপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন্! যে জল আপনার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে সে বহুক্ষণ হইল সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে, আপনি অন্যায় করিয়া নির্দ্দোষীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেছেন। রাজা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন।

(১) সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনকার।

নাই, চৈতন্য পদার্থও বিদ্যমান নাই, জগৎ শূন্য, সংসার অলীক। (১) দার্শনিকদিগকে এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে দোলায়মান দেখিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন:—"কেহ কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করেন, কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করেন, কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন এবং কেহ কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না।"(২)

ন্যায়দর্শনমতে জীবাত্মার স্বরূপ।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে ন্যায়দর্শনের মত অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা জীবাত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব। জীবাত্মা অদৃষ্টপরতন্ত্র, (৩) শরীরাদির অধিষ্ঠাতা, (৪)

---

(১) মাধ্যমিক দর্শনকার।—মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বলেন শূন্যই জগতের উপাদান এবং জগৎ শূন্যেই পর্য্যবসিত হইবে। আমরা ঘট, পট, মনুষ্য ইত্যাদি যাহা কিছু অনুভব করিতেছি উহা সকলই মায়া। যেমন ইন্দ্রজালবিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কৌশল প্রভাবে নানাবিধ বস্তু প্রদর্শন করে, কিন্তু ঐ সকল বস্তুর কোনটীরই যথার্থ সত্তা নাই সেইরূপ আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ পদার্থ অনুভব করিতেছি প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদের কাহারও অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যার নাশ হইলে ঐ সকল বস্তুর ধ্বংস হইবে এবং জগৎ ও আমি উভয়েই শূন্যতায় পরিণত হইব। "আমি শূন্যতামাত্র" এই জ্ঞান জন্মিলেই আমার নির্ব্বাণমুক্তি হইবে।

(২) আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈবচান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥—(গীতা)

(৩) ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অদৃষ্ট বলে, জীবাত্মা এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অধীন হইয়া যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন।

(৪) জীবাত্মার সংযোগেই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

ইচ্ছা, প্রযত্ন জ্ঞানাদির আশ্রয়, সুখ দুঃখের ভোক্তা, সংসারী, (১) বিভু, (২) অনেক, (৩) এবং নিত্য। বুদ্ধি (৪), সুখ, দুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই নয়টী আত্মার গুণ। মুক্তাবস্থায় আত্মা নির্গুণ ও নির্ব্বিকার হইয়া পড়েন। দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলেই আত্মার উক্ত গুণসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় (৫) ও মনোমাত্রের গোচর (৬)।

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ।

"আমি জানি" "আমি সুখী" ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রথের গতিদর্শনে সারথির

---

(১) যিনি পুনঃ পুনঃ সংসরণ করেন অর্থাৎ এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তর আশ্রয় করেন।

(২) সর্ব্বব্যাপী।

(৩) ন্যায় মতে জীবাত্মা অসংখ্য।

(৪) বুদ্ধি দুই প্রকার, অনুভূতি ও স্মৃতি। সংস্কারোৎপন্ন জ্ঞানের নাম স্মৃতি। পূর্ব্বানুভূত বস্তু আত্মায় সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে এবং পরে উপযুক্ত উদ্বোধক উপস্থিত হইলে ঐ বস্তুর স্মরণ হয়। অনুভূতি চারি প্রকার; প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার; দর্শন, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, স্পার্শন ও মানস। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে প্রত্যক্ষ জন্মে, যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত রূপের সন্নিকর্ষ হইয়া মনঃসংযোগ হইলে দর্শন প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। এইরূপে কর্ণের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে শ্রবণ প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্তু মন ত্বকের সহিত সংযুক্ত না হইলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। সুষুপ্তি অবস্থায় মন পুরীতৎ নামক নিস্ত্বক্ নাড়ীতে অবস্থিতি করে বলিয়া ঐ সময়ে কোন প্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না।

(৫) অহং এই জ্ঞানের বিষয়।

(৬) চাক্ষুষআদি ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে কেবল মানস প্রত্যক্ষের গোচর।

বিদ্যমানতা যেরূপে অনুমিত হয়, প্রবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা সেইরূপ আত্মারও অনুমান হইয়া থাকে। ন্যায় বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে আত্মার যে স্বরূপ বর্ণিত আছে, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত এবং শ্রবণানন্তর তদ্বিষয়ে দৃঢ়রূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর যোগাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ দর্শন করা উচিত (১)। এই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এরূপ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান জন্মিলে পাপপুণ্য-সাধিকা প্রবৃত্তির নাশ ও জন্মের উচ্ছেদ হয়। জন্মের অভাবে শরীরের অভাব হয় ও তজ্জন্য দুঃখের আত্যন্তিকবিনাশ হইয়া থাকে, উক্ত প্রকার দুঃখ নাশের পর আত্মার আর দুঃখ জন্মে না, এই আত্যন্তিক দুঃখের উচ্ছেদই মুক্তি।

---
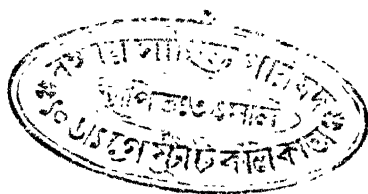
(১) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ ইতিশ্রুতিঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রতিপক্ষগণের মতখণ্ডন ও স্বতন্ত্র জীবাত্মার অস্তিত্ব সংস্থাপন।

দেহাত্মবাদ খণ্ডন।

কেহ কেহ বলেন চৈতন্যের আশ্রয় শরীরই আত্মা। শরীরই অহঙ্কারের (১) আস্পদ, আমি গৌর, আমি স্থূল ইত্যাদি প্রত্যয় শরীরেই আরোপিত হইয়া থাকে।

এরূপ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। যদি শরীর চেতন হইত তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীর বিদ্যমান আছে অথচ চৈতন্য নাই কেন? আর চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীরের অবয়ব হস্ত পদাদিতে ও চৈতন্য থাকিত। যদি বল হস্ত পদাদিই চৈতন্যের আধার তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, হস্ত পদ মস্তক কর্ণ ইত্যাদি বহু অবয়বের বহুচৈতন্যের ঐকমত্য কিরূপে হইয়া থাকে? বহু চেতন পদার্থের তুল্যানুভূতি কিছুতেই সম্ভব হয় না। আমার বেদনায় অপরের বেদনা অনুভব হয় না এবং অপরের বেদনায় আমার বেদনা উপস্থিত হয় না। হস্ত দ্বারা কোন বস্তু স্পর্শ করিলে ঐ স্পর্শ জ্ঞান হস্তেরই হইবে এবং পদদ্বারা কোন বস্তু স্পর্শ করিলে ঐ স্পর্শজ্ঞান পদেরই হইবে, একের জ্ঞান অন্যের হইবে না। আমি হস্ত দ্বারা যে বস্তু স্পর্শ করিলাম আবার পদদ্বারা সেই বস্তুই স্পর্শ করিলাম এবং উভয় অঙ্গদ্বারা

---

(১) অহং এই জ্ঞানের বিষয়।

স্পৃষ্ট বস্তু একই বস্তু বলিয়া জানিলাম। এরূপ ঐকমত্য হস্ত ও পদের হইতে পারে না কারণ পদ কিরূপে জানিবে যে হস্ত ঐ বস্তু স্পর্শ করিয়াছিল অতএব হস্ত ও পদ ব্যতীত কোন আত্মা আছেন, যিনি হস্ত ও পদ উভয়বিধ অঙ্গ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের আশ্রয়।

আর হস্তচ্ছেদ হইলে ঐ হস্ত দ্বারা অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। যে যে বস্তু অনুভব করে সে সেই বস্তু স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু যে যাহা অনুভব করে নাই সে তাহা কিরূপে স্মরণ করিবে? হস্ত যে বস্তু অনুভব করিয়াছিল হস্তের অভাবে সে বস্তু কে স্মরণ করিবে? সুতরাং হস্তাদি ব্যতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র আত্মা বিদ্যমান আছেন।

পরমাণু চৈতন্যবাদ খণ্ডন।

যদি বল শরীরের উপাদানে সূক্ষ্মমাত্রায় জ্ঞান ও শরীরে স্ফুট জ্ঞান থাকায় ঐকমত্যের অনুপপত্তি হইবে না, তাহাও বলিতে পার না কেন না তাহা হইলে স্মরণাদি জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকায় তদাশ্রিত চৈতন্যাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পুনশ্চ শরীরের মূল কারণ পরমাণুতে যদি চৈতন্য থাকিত তাহা হইলে ঐ পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত ঘটাদিতেও চৈতন্য থাকিত কিন্তু ঘটাদিতে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না অতএব পরমাণুতে চৈতন্য ছিল না। যদি বল ঘটাদিতেও সূক্ষ্মমাত্রায় চৈতন্য আছে তাহা হইলে উত্তর এই যে ঐ ঘটাদির চৈতন্য কোন প্রমাণ দ্বারাই উপলব্ধ হয় না। সর্ব্ব প্রমাণের অগোচর বস্তু স্বীকার করিলে 'শশবিষাণ' "গগনকুসুম" ইত্যাদিরও অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে অতএব নানা অবয়বে নানা চৈতন্য কল্পনা করা অপেক্ষা

চৈতন্যের আধার এক দ্রব্যান্তর (আত্মা) কল্পনা করাই উচিত।

মহাভূতসমূহের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যদিও ভূত সকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে, গুড় তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। (১) যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই বাল্যকালে দৃষ্ট পদার্থের যৌবন কালে স্মরণ কিরূপে হইয়া থাকে? প্রতিদিন দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, দেহের পরিমাণ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং ঐ পরিমাণের ভেদ দ্বারা দ্রব্যের ভেদ হইতেছে। আশ্রয়ের নাশ না হইলে পরিমাণের নাশ হয় না। বাল্যশরীরের পরিমাণের নাশ হইয়াছে দেখিয়া ঐ পরিমাণের আশ্রয় বাল্যশরীরেরও নাশ হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব বাল্য শরীর যে বস্তু দর্শন করিয়াছিল যৌবন শরীর সেই বস্তু কিরূপে স্মরণ করিবে? যে দর্শন করিয়াছিল তাহার নাশ হইয়াছে, অপর কে ঐ দৃষ্ট বস্তু স্মরণ করিবে? যদি বল কারণ যে বস্তু অনুভব করিয়াছিল কার্য্য সেই বস্তু স্মরণ করুক অর্থাৎ পূর্ব্বশরীরে উৎপন্ন সংস্কার সকল পরবর্ত্তি শরীরে সংক্রান্ত হউক একথাও বলিতে পার না, কেন না তাহা হইলে মাতাকর্ত্তৃক অনুভূত বস্তুর গর্ভস্থশিশু কর্ত্তৃক স্মরণ হইত। মাতা যে সকল বস্তু

(১) চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যোদ্রব্যেভ্যোমদশক্তিবৎ॥ ইতি চার্ব্বাকঃ।

দর্শন করিয়াছিলেন মাতার শরীর হইতে উৎপন্ন সন্তান সেই সকল বস্তু কেন স্মরণ করিতে পারে না? অতএব ভূত সমূহের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে একথা বলা অসঙ্গত।

দেহ চেতন হইলে বালকের প্রথমপ্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না এবং "এই বস্তু আমার প্রিয়" "এই বস্তু আমার অপ্রিয়" ইত্যাদি জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছা জন্মে না। এজন্মে তাহার ইষ্টানিষ্টের কোন জ্ঞান হয় নাই তবে তাহার ইচ্ছা কেন জন্মিল? সে জন্মান্তরে অনুভূত ইষ্ট ও অনিষ্টের স্মরণ করিতেছে একথাও বলিতে পার না কেন না জন্মান্তরীয় শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত চেতন-বাদিমতে জন্মান্তরানুভূত ইষ্ট ও অনিষ্টের স্মরণ হয় বলিয়া প্রবৃত্তি জন্মিতেছে।

দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করিলে শরীর নষ্ট হইলে তৎকৃত হিংসাদি ফলের অনুপভোগ হইয়া পড়ে এবং কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। শরীর দ্বারা আমি যে পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম শরীরের নাশ হইলে তাহার ফলভোগ কে করিবে? সুতরাং কৃতহানি দোষ ঘটিল, আর পূর্ব্বজন্মে কোনও পুণ্য বা পাপ করি নাই কিন্তু শরীরধারণ করিয়াই সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছি, ইহাতে অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটিল।

কৃতপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ।

যদি 'আমি গৌর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি অনুভবই দেহাত্ম-বাদের প্রমাণ হইল, 'আমার শরীর' 'আমার চক্ষু' ইত্যাদি অনুভবই বা দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ কেন না হইবে? আর শ্রুতিতে ও "আত্মাকে রথী বলিয়া জানিও দেহকে রথ

বলিয়া জানিও” ইত্যাদি বাক্যে দেহাতিরিক্ত আত্মার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই দেহ আত্মা নহে। নির্ব্বোধজীব মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভৌতিক দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী যখন আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করিতেছে তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই পঞ্চ ভূতাত্মক কলেবরকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবেন!

কেহ কেহ বলেন “প্রাণই আত্মা”। তাহা হইতে পারে না, কেন না তাহা হইলে স্মরণাদি অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রাণ বায়ুর প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে যে প্রাণ বায়ু আমার দেহে অবস্থিতি করিতেছে পর মুহূর্ত্তে আর উহা দেহে অবস্থিতি করিবে না। অতএব বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে অনুভব করিল, পর মুহূর্ত্তে সে থাকিল না সুতরাং অনুভবিতার অভাবে কে স্মরণ করিবে? কিন্তু আমরা নিয়ত পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ করিতেছি। প্রাণাতিরিক্ত আত্মার বিষয় প্রশ্নোপনিষদে লিখিত আছে “আত্মা হইতেই এই প্রাণ জন্মিয়াছে, যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ বিস্তৃত রহিয়াছে, মনের সংকল্প মাত্রেই প্রাণ এই শরীরে আগমন করিয়াছে। (১)

প্রাণাত্মবাদ খণ্ডন।

ন্যায় দর্শন মতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পাঁচটী বাহ্যেন্দ্রিয়; মন অন্তরিন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় মনের সহ-

(১) আত্মন এষ প্রাণোজায়তে
যথৈষা পুরুষেছায়ৈতস্মিন্ এতদাততম্।
মনঃকৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে। প্রশ্নোপনিষৎ।

কারিতা ব্যতীত দর্শনাদি জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না, কিন্তু মন স্বয়ংই স্মরণাদি জ্ঞান জন্মাইতে পারে। এই ষড়িন্দ্রিয় ব্যতীত প্রতি শরীরে এক এক জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া না লইলে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় বা মন, দর্শন, স্পর্শন, স্মরণাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারেন না।

ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব সংস্থাপন।

ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণই দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা ও চৈতন্য ইন্দ্রিয় সমূহেই বিদ্যমান আছে এইরূপ কথা বলা অসঙ্গত। কেন না কোন ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে তদিন্দ্রিয়জনিত স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা কোন বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুর নাশ হইল অথচ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতেছে। অবশ্যই যে অনুভব করিয়াছিল সেই স্মরণ করিবে। অনুভবিতা চক্ষুরিন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই। অপর কাহাকর্ত্তৃক স্মরণ ও সম্ভবপর নহে অতএব ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা আছেন, যিনি মন ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে চক্ষুর নাশ হইলেও তৎপদার্থের স্মরণ করিতেছেন।

দর্শনস্পর্শনাদিদ্বারা একার্থের প্রতিপাদন আত্মার কার্য্য। কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বস্তু দর্শন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহা স্পর্শ করিতেছেন এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বস্তু একই বলিয়া জানিতেছেন। আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়েরদ্বারা ঘট দেখিলাম ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা উহাই স্পর্শ করিলাম এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট ঘট একই পদার্থ বলিয়া জানিলাম। যে বস্তু দর্শন করিয়াছি

সেই বস্তুই স্পর্শ করিতেছি এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দ্রষ্টা ও স্প্রষ্টা একই ব্যক্তি না হইলে হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ। চক্ষু কোন বস্তুর স্পর্শ বা ত্বগিন্দ্রিয় কোন বস্তুর রূপ অনুভব করিতে পারে না, যে আমি কোন বস্তুর রূপ অনুভব করিয়াছি সেই আমিই ঐ বস্তুর স্পর্শ অনুভব করিতেছি এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয়ের হইতে পারে না সুতরাং চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতীত এক কর্ত্তা আছেন, যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনিই স্পর্শ অনুভব করিতেছেন এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বস্তু একই বলিয়া জানিতেছেন। দর্শন স্পর্শনাদির সেই এক কর্ত্তাই আত্মা।

মনশ্চৈতন্যবাদ খণ্ডন।

কেহ কেহ বলেন "সেই কর্ত্তা মন, মনই আত্মা, মনব্যতীত আত্মা নামক কোন পদার্থ নাই। মনই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের দর্শন করেন, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের অনুভব করেন ও নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া থাকেন। মনই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়, মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা দর্শন করিলেন, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাই স্পর্শ করিলেন এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বস্তু একই বলিয়া জানিলেন। বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইত্যাদি সে সমস্ত গুণ আত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে উহা বাস্তবিক পক্ষে মনেরই গুণ।"

এরূপ বলিলে প্রত্যুত্তর করা যাইতে পারে যে তিনি যাহাকে মন বলিতেছেন উহা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মারই নামান্তর মাত্র, কেন না তাঁহাকে মনব্যতীত এক অতিরিক্ত অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়, কর্ণেন্দ্রিয়

দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়, নাসিকা দ্বারা গন্ধের জ্ঞান হয়, জিহ্বা দ্বারা রসের জ্ঞান হয়, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান হয়, সুখ দুঃখাদির জ্ঞান কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হয়? সুখ দুঃখাদি চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, অপর ত্রিবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারাও সুখ দুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। অতএব সুখ দুঃখাদির অনুভবের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। সেই অন্তরিন্দ্রিয়ই মন এবং ঐ মনের সাহায্যে যিনি সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন সেই কর্ত্তার নাম জীবাত্মা। অতএব জীবাত্মা ও মন উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। যদি বল মন স্বয়ংই সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, সুখ দুঃখাদি অনুভবের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়বিশেষের প্রয়োজন হয় না এ কথাও নিতান্ত অযৌক্তিক। (১) অনিত্য জ্ঞান মাত্রেরই উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা প্রয়োজন হয়। সংসারে দর্শন শ্রবণাদি যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে উহারা সকলেই অনিত্য সুতরাং দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয় বিশেষের সহকারিতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি এই জ্ঞানসমূহ নিত্য হইত তাহা হইলে ঐ সকল জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হইত না কাজেই ইন্দ্রিয়বিশেষের সদ্ভাব বা অভাবের প্রয়োজনও হইত না। অতএব সুখ দুঃখাদি সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে

(১) "সুখসাক্ষাৎকারঃ সকরণকো জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ চাক্ষুষবৎ।" জন্য সাক্ষাৎকার মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা আছে। সুখ সাক্ষাৎকার জন্য সাক্ষাৎকার সুতরাং সুখসাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়বিশেষের সহকারিতা আছে। দৃষ্টান্ত, যেমন দর্শনসাক্ষাৎকারে চক্ষুর সহকারিতা আছে।

হইবে। কর্ত্তা ঐ অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা ঐ কর্ত্তাকে আত্মা ও অন্তরিন্দ্রিয়কে মন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলাম, প্রতিপক্ষ ঐ আত্মাকে মন ও অন্তরিন্দ্রিয়কে অপর কোন নামে অভিহিত করিতেছেন। ফলতঃ উভয়পক্ষকেই পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয় ও এক স্বতন্ত্র কর্ত্তার অস্তিত্ব মানিতে হইল। আমরা ঐ কর্ত্তাকে আত্মা ও ঐ অন্তরিন্দ্রিয়কে মন বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। প্রতিপক্ষ ঐ কর্ত্তাকে মন বলিয়া অভিহিত করিলেন। ঐ অন্তরিন্দ্রিয়কেও অবশ্য অপর কোন নামে অভিহিত করিবেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে আমরা যাহা যাহা স্বীকার করি প্রতিপক্ষ সে সমস্তই স্বীকার করেন, প্রকৃতবিষয়ে কোন বিবাদ নাই; কেবল ঐ পদার্থ গুলির নামকরণে পার্থক্য হইতেছে। যদি বল বিষয় সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা প্রয়োজন হয় এ কথা অগ্রাহ্য, দর্শন সাক্ষাৎকারে চক্ষুর সহকারিতা প্রয়োজন হয় একথা কে বলিল? সুতরাং যে অনুমান দ্বারা সুখ দুঃখাদি সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে উহা ভ্রান্তি মূলক। তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই বিষয় সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা প্রয়োজন না হইলে অন্ধ ব্যক্তিও রূপ দর্শন করিতে পারিতেন, বধিরও শব্দ শ্রবণ করিতে পারিতেন অথচ ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে অন্ধ ব্যক্তি রূপ দর্শন করিতে পারেন না ও বধির শব্দ শুনিতে পান না সুতরাং এক একটী বিষয়ের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক একটী ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুখ দুঃখাদি সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় সেই ইন্দ্রি-

য়ের নাম কি? এবং যিনি সুখ দুঃখ অনুভব করেন সেই কর্ত্তারই বা নাম কি? ইহার উত্তরে মন ও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

যদি বল "সুখ দুঃখাদি সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয়ের (মনের) অস্তিত্ব অগত্যা স্বীকার করা গেল, সেই ইন্দ্রিয়ই কর্ত্তা, করণাতিরিক্ত কর্ত্তা স্বীকার করিনা।" একথা বলিতে পার না, কেন না করণমাত্রই কর্ত্তার সহকারিতা ব্যতীত ক্রিয়া নিষ্পাদনে অসমর্থ। (১) কুঠারাদি অস্ত্র অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইলেও কোন কর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত না হইলে স্বয়ং বৃক্ষাদি ছেদন করিতে পারে না। সেইরূপ মনও জীবাত্মা কর্ত্তৃক বিষয়ে ব্যাপৃত না হইলে স্বয়ং কোন জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। উক্ত যুক্তিদ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের এক প্রযোক্তার অনুমান করিতে হইবে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সেই প্রযোক্তাই আত্মা।

মন একাধারে দর্শন শ্রবণাদির কর্ত্তা ও করণ উভয় হইতে পারে না।

উপরি লিখিত যুক্তি সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল কেবল কর্ত্তা বিষয় সাক্ষাৎকার করিতে পারে না, এবং কেবল করণ দ্বারাও বিষয় সাক্ষাৎকার হয় না; কর্ত্তাও করণ উভয়ই চাই। সেই কর্ত্তা আত্মা ও করণ চক্ষু হইতে মন পর্য্যন্ত ছয়টী ইন্দ্রিয়। যদি বল মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই অর্থাৎ মনই কর্ত্তা মনই করণ। মন মনের সাহায্যে অর্থাৎ স্বয়ংই জ্ঞান সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন; তাহা হইলে উত্তর এই যে

(১) "ইন্দ্রিয়ং কর্ত্তৃপ্রযোজ্যং করণত্বাৎ বাস্যাদিবৎ।" করণ সমূহ কর্ত্তৃপ্রযোজ্য। ইন্দ্রিয় করণ সুতরাং ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃপ্রযোজ্য।

কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বের পরস্পর বিরোধ হেতু একই পদার্থ যুগপৎ কর্ত্তা ও করণ উভয়ই হইতে পারে না। যদি বল হইতে পারে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয় স্বরূপ যে মন, উহা অণু মহৎ বা পরম মহৎ? যদি মন মহৎ বা পরমমহৎ হইত তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত। কারণ যখন মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া দর্শন জ্ঞান উৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ জ্ঞান উৎপাদনেও ব্যাপৃত থাকিতে পারিত। কিন্তু সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যুগপৎ দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না অতএব মন মহৎ বা পরম মহৎ নহে।

যদি বল একাধারে কর্ত্তা ও করণস্বরূপ যে মন উহা অণু, তাহা হইলে মনের গুণ জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আশ্রিত প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়ের মহত্ত্ব কারণ। যেমন পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকায় তদ্গতপরিমাণাদির প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ মনের মহত্ত্ব না থাকায় উহার গুণ জ্ঞান সুখাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান সুখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, নতুবা কেহই জ্ঞান সুখাদি অনুভব করিতে পারিতেন না সুতরাং যে মনকে তুমি একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই বলিয়া স্বীকার করিয়াছ সেই মন অণু মহৎ বা পরমমহৎ কিছুই নহে। যে বস্তু অণু মহৎ বা পরম মহৎ কিছুই নহে এমন বস্তুই হইতে পারে না। এতএব মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ একথা বলা অসঙ্গত।

মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই হইতে পারে না,

এ প্রতিজ্ঞা নিম্নলিখিত তর্কশাস্ত্রোচিত ভাষায় বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

কর্ত্তা করণের সাহায্যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ করেন, মন মনের সাহায্যে জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন, কেন না মনই কর্ত্তা মনই করণ। এই মন মহৎ পরমমহৎ বা অণু ইহার অন্যতম হইবে। (১) কোন প্রকারেই মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয় হইতে পারে না। 'অণুমন অণুমনের সাহায্যে সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন' এ প্রতিজ্ঞা ভ্রমপূর্ণ। কেন না মন অণু বলিয়া উহার আশ্রিত জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ হইত না।

(২) 'মহৎমন মহৎমনের সাহায্যে জ্ঞানসুখাদির প্রত্যক্ষ করেন' এ প্রতিজ্ঞা ভ্রমাত্মিকা, কেন না যে বস্তুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ জন্মে সেই বস্তু মহৎ বা প্রকৃষ্ট পরিমাণ বিশিষ্ট হইলে এক কালে চক্ষু কর্ণাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি উৎপন্ন করিত।

(৩) মহৎ মন অণুমনের সাহায্যে জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন। এ প্রতিজ্ঞায় কোন দোষ নাই; কেন না অণুমনের সাহায্যে জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি উৎপন্ন হইতেছে না এবং যে জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহাদিগের আশ্রয় স্বরূপ মন মহৎ। সুতরাং আশ্রয়ের মহত্ত্ব হেতু জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নাই।

এই মহৎ মনই আত্মা ও অণুমনই মন। সুতরাং আত্মা মনের সাহায্যে জ্ঞান সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

যদি বল "আত্মা পরমমহান্ সুতরাং যুগপৎ তাঁহার দর্শন শ্রবণাদি উৎপন্ন হউক ;" তাহা হইতে পারে না, কেন না যে মনের সাহায্যে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন সে মন অণু। যদিও আত্মার যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি করিবার ক্ষমতা ছিল তথাপি যে মনের সাহায্যে দর্শনাদি করিতেছেন সেই মন অণু বলিয়া যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারিতেছেন না।

অপিচ যদি অণুমনই আত্মা হইত, তাহা হইলে এককালে সমস্ত অঙ্গে চৈতন্য থাকিতে পারিত না। অণুমন যে কালে হস্তে থাকে সে কালে পদে থাকিতে পারে না, যে কালে মস্তকে থাকে সে কালে হস্তে থাকিতে পারে না। এককালে কোন অঙ্গ চেতন ও কোন অঙ্গ অচেতন হইয়া পড়ে এবং এককালে দুই তিন অঙ্গের সুখ ও বেদনাদি অনুভব করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকলেই এককালে দুই তিন অঙ্গের বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন সুতরাং অণু মন আত্মা নহে। আর আত্মা অণু হইলে এককালে বাম ও দক্ষিণ চরণ দ্বারা গমন অসম্ভব হইয়া পড়ে কেন না এক চরণ চেতন ও অন্য চরণ অচেতন হইয়া পড়ে অথচ এককালে চরণাদির পরিচালনা হইয়া থাকে সুতরাং অণুমন আত্মা নহে। আর আত্মা অণু স্বীকার করিলে তত্ত্বজ্ঞানীরা যে এককালে নানা শরীর কল্পনা করিয়া সুখ দুঃখাদিরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন ইহাও অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ অণু বস্তু এককালে বহু শরীরে থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মাকে বিভু স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। যদি বল "আত্মা যে বিভু ইহার প্রমাণ কি?" ইহার

ন্যায় মতে জীবাত্মা বিভু।

প্রমাণ এই যে, যে বস্তু নিত্য ও অমূর্ত্ত তাহা বিভু (১)। আত্মা নিত্য, এখন আছে পরক্ষণে থাকিবে না এরূপ কালিক পরিচ্ছেদ আত্মার নাই; এবং আত্মা অমূর্ত্ত, আত্মা বিংশতিহস্ত দীর্ঘ দশ হস্ত বিস্তৃত এরূপ দৈশিকপরিচ্ছেদ আত্মায় নাই সুতরাং আত্মা বিভু বা বিশ্বব্যাপক। "আত্মা অণু হইতেও অণুতর" এই শ্রুতির অনুশাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কেহ কেহ বলেন আত্মা অণু কিন্তু ইহা অযৌক্তিক কেন না আত্মা বিভু না হইলে মন অণু হইতে পারিত না এবং আত্মা ও মন এতদুভয়ের সংযোগবশতই জ্ঞানাদি ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে সুতরাং উদ্ধৃত শ্রুতিতে মনঃসংযুক্ত আত্মার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং মনের অণুত্ব বশতঃ উক্ত শ্রুতিবিরোধও হইতে পারে না। ঐ শ্রুতির প্রথম পদে বিন্যস্ত "মহৎ হইতেও মহত্তর" এই অনুশাসন প্রকৃত আত্মা বিষয়ক এবং "মহৎ হইতেও মহত্তর ও অণু হইতেও অণুতর" এই সমগ্র শ্রুতি (২) মনঃসংযুক্ত আত্মা বিষয়ক অতএব শ্রুতিতে আত্মার বিভুত্বের বিরোধি কথা উক্ত হয় নাই। শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে অশরীরী আত্মা অনিত্য শরীরে অবস্থিত আছেন, এই মহান্ বিশ্বব্যাপক আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না। (৩)

---

(১) নিত্যত্বে সতি অমূর্ত্তত্বাৎ (আত্মতত্ত্ববিবেকঃ)
যদ্বা সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্বং বিভুত্বম্। (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)

(২) মহতোঽপি মহীয়াংসং, অণীয়াংসমণোরপি ইতি—শ্রুতিঃ।

(৩) অশরীরং শরীরেষনবস্থেষবস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"
ইতি কঠোপনিষৎ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জীবাত্মার নিত্যত্ব ও জন্মান্তরপরিগ্রহতত্ত্ব।

জীবাত্মা অনাদি ও অনন্ত।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে শরীর মন ইন্দ্রিয় ইত্যাদির অতিরিক্ত আত্মা আছেন। এরূপ আত্মা কোনরূপেই অনিত্য হইতে পারে না অনিত্য বস্তু মাত্রেরই উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ আছে। আত্মার উৎপত্তির কারণ কি? কি উপাদানে আত্মা গঠিত হইয়াছে? সে সকল উপাদান আত্মোৎপত্তির পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং আত্মার ধ্বংসের পরেই বা কোথায় থাকিবে? শরীরের সহিত আত্মার কি প্রকারে সম্বন্ধ ঘটিল? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর অনিত্য আত্মার নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে না। যদি বল শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে, আত্মা শরীরাতিরিক্ত বিশেষ কিছু নহেন, তাহা হইলে দেহাত্মবাদ আসিয়া পড়ে। দেহ যে আত্মা নহে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল শরীরোৎপত্তির সময়ে আত্মা উদ্ভূত হইয়াছেন, শরীরের ধ্বংস হইলেও তাঁহার ধ্বংস হইবেনা, তাহা হইলে আপত্তি এই যে জন্য-পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইবে, আত্মা জন্য (উৎপন্ন) পদার্থ সুতরাং তাহার ধ্বংস হইবে। আর এরূপ উৎপাদিত

স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহেরও মীমাংসা হয় না। যদি বল আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নহেন, আত্মা চিরকালই বিদ্যমান আছেন, কিছু কালের নিমিত্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আপত্তি এই আত্মসমূহের এরূপ বিনাশ হইলে জগৎ অচিরকাল মধ্যে আত্মবিহীন হইয়া পড়িবে, সজীব পদার্থের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে অতএব আত্মা স্বীকার করিলেই উহা নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, ইনি অজ নিত্য ও পুরাণ শরীরের নাশ হইলেও ইঁহার নাশ হয় না। (১)

জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধন এবং উর্দ্ধ ও অধো গতি।

আত্মা অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান থাকিয়া সংসারচক্রের মধ্যে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং যত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার মুক্তি না হয় তত কাল তাঁহাকে আরও বহু জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সূত্রগ্রথিত পুষ্পনিচয়ের একে একে স্খলন হইলেও সূত্রটী যেরূপ অক্ষত থাকে সেইরূপ আত্ম-পরিগৃহীত দেহ সমূহের একে একে ক্ষয় হইলেও আত্মা অবিকৃত থাকেন। সংসারে এমন কোন কারণ নাই যাহা হইতে আত্মার ধ্বংস হইতে পারে। মুক্তি হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না পরন্তু তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। কুম্ভকারের চক্র যেমন

---

(১) ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
কঠোপনিষৎ।

অন্তর্গত শক্তি প্রভাবে অনবরত ঘূর্ণমান হইতে থাকে সেইরূপ সংসার চক্র ও কর্ম্মফল রূপ অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে। যেমন কোন কাচকূপীর মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখ বদ্ধ করিলে ঐ মধুকর গুলির কেহ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ কেহ অধোদেশে গমন কেহ বা মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু কেহই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় না সেইরূপ জীব সকল শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা সংসার-চক্রে আবদ্ধ হইয়া কেহ সুরলোক কেহ নরলোক কেহবা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই সংসরণশীল জীব সকল পরস্পর পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সতত বিচরণ করিতেছে। কেহই সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে না ইনিই চিরকাল আমার পিতা এবং ইনিই চিরদিন আমার মাতা ছিলেন অপর যে সকল জীব আছে তাহাদের সহিত আমার কোনকালে পিতৃসম্বন্ধ বা মাতৃসম্বন্ধ ছিল না, কারণ একটী সামান্য জীবও কোটি কোটি জন্মে অপর উন্নত জীবের পিতা মাতা হইতে পারে, বর্ত্তমান জন্মের সম্বন্ধই চরম সম্বন্ধ নহে। (১)

(১) শত্রুমিত্র কলত্রাণাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরো বিবিধাস্তথা॥
অনুভূতানি সৌখ্যানি দুঃখানি চ সহস্রশঃ।
বান্ধবা বহবঃ প্রাপ্তাঃ পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
ভৃত্যতাং দাসতাঞ্চৈব গতোঽস্মি বহুশোনৃণাম্।
স্বামিত্বমীশ্বরত্বঞ্চ দরিদ্রত্বং তথাগতঃ॥

কেহ কেহ জন্মান্তর স্বীকার করেন না কিন্তু সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দৈহিক পরমাণুনিচয়ের প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, শৈশবের পর যৌবন ও বার্দ্ধক্য সমুপস্থিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রতি সপ্তবর্ষে দেহাবয়বের সম্পূর্ণ নবীকরণ হইয়া থাকে। সপ্তবর্ষাভ্যন্তরে প্রত্যেক পরমাণুর বিচ্যুতি হইয়া দেহাবয়বে নূতন পরমাণু সংস্থাপিত হয় অথচ দেহধারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না। এখন যদি দেহের শত পরিবর্ত্তনেও জীবের আত্মত্ব লুপ্ত না হয় তাহা হইলে মৃত্যুরূপ দৈহিক পরিবর্ত্তনেই বা আত্মার অত্যন্ত ধ্বংস কিরূপে হইবে? আমি সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিলাম এখনও তাহাই আছি অথচ শরীরের ও মনের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব দৃষ্ট হইতেছে, ইহজন্মে শারীরিক ও মানসিক শত পরিবর্ত্তনেও আমির আমিত্ব লুপ্ত হয় না, তবে মৃত্যুরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তনেই বা আমিত্বের একান্ত বিনাশ কিরূপে সম্ভব হয়? মৃত্যু শব্দের অর্থ আত্মার ধ্বংস নহে দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদমাত্র। আমার এক দেহের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ ঘটে।

পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি।

গৌতম বলেন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর স্তন্য পানে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বের অভ্যাস ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মে না এবং পূর্ব্ব শরীর ব্যতীত অভ্যাস হইতে

গৌতমের মত।

পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃকলত্রাদিকৃতেন চ।
তুষ্টোঽসকৃত্তথা দৈন্যমশ্রুধৌতাননো গতঃ॥
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা তাত সঙ্কটে।
জ্ঞানমেতন্ময়াপ্রাপ্তং মোক্ষসংপ্রাপ্তিকারকম্॥ (মার্কণ্ডেয়পুরাণম্)

পারে না। অতএব পূর্ব্ব শরীর ও পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হইল। দেখা যায় জীব ক্ষুধিত হইলে আহার করিতে অভিলাষ করে। আহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া সে জানিয়াছে আহারই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায়। এই পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতিবশতঃ তাহার উক্ত প্রকার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। এ জন্মে সে কখনও শিখে নাই আহারই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় তবে কেন তাহার আহারে অভিলাষ জন্মে? এখানে বলিতে হইবে জাতমাত্র শিশু ক্ষুধিত হইয়া পূর্ব্বাভ্যাস স্মরণ করতঃ আহারে অভিলাষ করিয়া থাকে। আত্মা পুর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করতঃ ক্ষুধাদ্বারা পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারের স্মরণ পূর্ব্বক স্তন্যপানে অভিলাষ করে।

যদি বল লৌহ যেমন অভ্যাস ব্যতীত ও অয়স্কান্তের দিকে উপসর্পণ করে সেইরূপ শিশু পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীতও স্তন্যপানে অভিলাষ করে তাহা হইলে বক্তব্য এই—শিশুর স্তন্যপান ক্রিয়া প্রবৃত্তিপূর্ব্বক হইতেছে কিন্তু লৌহের গমন প্রবৃত্তিপূর্ব্বক নহে। লৌহ যে কালেই হউক না কেন অয়স্কান্তের সমীপে উপস্থিত হইলে তদভিমুখে ধাবিত হয় ইহাতে তাহার অভিলাষ বা অনভিলাষ নাই। কিন্তু শিশু ক্ষুধিত হইলেই স্তন্যপানে অভিলাষ করে, ক্ষুধার্ত্ত না হইলে অভিলাষ করে না। এই প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত আহারের স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন ক্রমেই উৎপন্ন হইতে পারে না।

ন্যায়দর্শনকার আরও বলেন কেহই বীতরাগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশু রাগদ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূতবিষয়ের অনুচিন্তনই রাগ

দ্বেষাদির কারণ। পূর্ব্বজন্মে বিষয়ের অনুভব ব্যতীত এজন্মে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাগদ্বেষাদির চিহ্ন প্রকাশ করিতে পারে না।

যদি বল দ্রব্য গুণসমন্বিত হইয়াই উৎপন্ন হয়, নির্গুণ দ্রব্যের উৎপত্তি কোথায়ও দেখা যায় না অতএব রাগদ্বেষাদিগুণ সহ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে আপত্তি এই সংকল্পবিকল্পদ্বারা রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু জড় পদার্থের গুণ সংকল্প বিকল্প দ্বারা উৎপন্ন হয় না। বিষয়ের আসেবন ব্যতীত সংকল্প বিকল্পের উদ্ভব হয় না। অতএব জাত বালকের রাগদ্বেষাদি দেখিয়া পূর্ব্ব জন্মানুভূত বিষয়ের অনুমান করিতে হইবে।

প্রাচীন ন্যায়ের যুক্তি সমূহের মর্ম্মার্থ।

নৈয়ায়িকের যুক্তিসমূহের মর্ম্মার্থ এই যে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবের রাগ দ্বেষাদি যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায় উহা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জগৎ ঐ সকল সংস্কারকে উদ্বোধিত করিতেছে মাত্র।

পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ স্মরণ।

স্মৃতিই পূর্ব্বজন্ম প্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন স্মরণের প্রামাণ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করা যাইতে পারে না বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই—অতীত ঘটনা স্মৃতি ভিন্ন আর কিসের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে? চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ হয় তাহা বর্ত্তমানকালবিষয়ক প্রমাণ, অতীত ও অনাগত বিষয় চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কর্ণদ্বারা শুনা যায় না অপর কোন

ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করা যায় না। আমি বলিতেছি কল্য বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম এই বাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? চক্ষুতে না স্মৃতিতে? অবশ্যই বলিতে হইবে, স্মৃতিই অতীত ঘটনার প্রমাণ। যদি আমি এই ঘটনা স্মরণ করিতে না পারিতাম তাহা হইলে চক্ষু দ্বারা বিদ্যালয়ে গমন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম বলিয়া কি তাহার কোন সত্যাসত্যের নির্ণয় হইত? যদি অতীত ঘটনার স্মৃতি ভিন্ন অপর প্রমাণ থাকিত তাহা হইলে দুষ্মন্তকে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান জনিত অনুতাপ ভোগ করিতে হইত না সুতরাং সিদ্ধ হইল স্মৃতিই অতীত ঘটনার প্রমাণ। নৈয়ায়িকেরা পূর্ব্ব জন্মের যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও স্মৃতিমূলক।

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি অস্বীকার করিবারও কোন কারণ দেখি না। যিনি বাঙ্গালা ভাষা কখনও জানেন না, বাঙ্গালা বর্ণমালা কখনও দেখেন নাই, এমন লোকের নিকট একখানি বাঙ্গালা পুস্তক লইয়া যাও তিনি উক্ত পুস্তকের ভাবগ্রহণে সমর্থ হইবেন না। আর একজন বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উক্ত পুস্তক লইয়া গেলে তিনি অবশ্য উহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হইবেন। "আত্মার ধ্বংস নাই" এই অক্ষর গুলি দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না—কিন্তু ঐ বাক্যটী দ্বিতীয় ব্যক্তির নয়ন গোচর হইবা মাত্র "আত্মা" এক অর্থ প্রকাশ করিবে "ধ্বংস" আর এক অর্থ প্রকাশ করিবে, এইরূপ প্রত্যেক শব্দ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবে, কেন না তিনি পূর্ব্বেই ঐ শব্দগুলির অর্থ জানিতেন, শব্দগুলি দেখিয়া অর্থ গুলি মনে পড়িল। যদিও সমগ্র বাক্যটী কোথায়ও পূর্ব্বে শিক্ষা

করেন নাই কিন্তু প্রত্যেক শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই জানিতেন। এই বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থ লইয়া এক নূতন অর্থের প্রতীতি হইল। আর প্রথম ব্যক্তি ঐ শব্দ গুলির অর্থ পূর্ব্বে জানিতেন না ও ঐ অক্ষরগুলির সহিত পূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন না সুতরাং অক্ষরগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে কোন অর্থেরই উপলব্ধি হইল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে—শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া বিশাল বিশ্ব সংসারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার মনে কত জ্ঞান জন্মিল, কত হর্ষ ভয় উৎপন্ন হইল। ঐ শিশুর অন্তরে যদি আকৃতি, রূপ ইত্যাদির জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে জগৎ দেখিয়া তাহার মনে কোন অর্থেরই প্রতীতি হইত না ও অন্তরে হর্ষ ভয়াদির উদ্রেক হইত না অতএব স্বীকার করিতে হইবে রূপ আকৃতি ইত্যাদির জ্ঞান ঐ শিশুর পূর্ব্বেই ছিল জগৎ দেখিয়া উহা মনে পড়িল। পূর্ব্বেই জানা ছিল স্বীকার করিলে পূর্ব্ব জন্মও স্বীকার করিতে হইবে।

সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ দ্বারা পূর্ব্বানুভূতির স্মরণ।

বালকেরা যখন প্রথমে মাতৃভাষা শিক্ষা করে, তখন পূর্ব্ব পরিচিত আকৃতি শব্দ ইত্যাদির সহিত মাতৃভাষার বর্ণমালা ও শব্দের সাদৃশ্য অন্বেষণ করে। এই সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা অক্ষর গুলির জ্ঞান হয়। এইরূপে যে কোন বস্তুর জ্ঞান হউক না কেন, পূর্ব্বে তৎসদৃশ বস্তুর সহিত পরিচয় ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই— শিশু যখন সর্ব্ব প্রথমে আকার রূপ রসাদি জানে তখন কোন্ বস্তুর আকারের সদৃশ আকার দেখে? কোন্ বস্তুর রূপের সদৃশ রূপ দেখে? অতত্রব শিশু এই সংসারে আসিবার পূর্ব্বে কিছু সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া

পার্থিব বিষয় চিনিতে পারে। শিশুর পূর্ব্বজন্মে যে চক্ষু কর্ণাদি ছিল তাহা এখন নাই, যে শরীর ছিল তাহাও নাই, সব নূতন, সে তখন কেবল স্মৃতির সাহায্য গ্রহণ করে। এই জগতের কোন বস্তুর সদৃশ বস্তু সে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছে কি না স্মরণ করিতে থাকে। দেখে পূর্ব্বানুভূত রূপ রসাদির সদৃশ বহু বস্তু এই জগতে আছে। এইরূপে বর্ত্তমান জগতের রূপ রসাদির ক্রমিক জ্ঞান হইতে থাকে। সামান্য বিশেষ ক্রমে সূক্ষ্মতর জ্ঞান জন্মিতে থাকে। ক্রমে এই সংসারের জ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মা পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া থাকে পূর্ব্ব সংসারের মমতা ত্যাগ করিয়া এই সংসারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। তখন নিজের স্বরূপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, দেহই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করিতেও প্রয়াস পান না, বর্ত্তমান জগতের অর্থ বুঝিয়াই যে আদর্শের সাহায্যে বুঝিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করেন। এইত ঘোর মোহ। শাস্ত্রকারেরা এবম্প্রকার দেহাত্মবাদের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়াছেন। দেহের সহিত সম্বন্ধ হইলেই আত্মার এ মোহ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানসমূহ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান সমূহকে আবৃত করিয়া ফেলে। এখন আর তুমি পূর্ব্ব জন্মানুভূতির কিরূপে স্মরণ করিবে? বাল্যকালে যখন এ পৃথিবীর জ্ঞান হয় নাই, তখন পূর্ব্বজ্ঞান (সংস্কাররূপে) সম্পূর্ণ পরিমাণে থাকে, এ সংসারের জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতীত জন্মের জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান বিনষ্ট হয় এ রূপ নহে কিন্তু বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞানে মিশিয়া যায় সুতরাং পূর্ব্ব জন্মের সম্যক্ স্মৃতি কিরূপে হইবে?

জন্মান্তরের অস্তিত্ব-বিষয়ে নব্যন্যায়ের যুক্তি।

নব্যনৈয়ায়িক বলেন, পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে অন্যথা সুখদুঃখাদির বৈষম্যের কারণ পাওয়া যাইবে না (১)। সংসারে কেহ সুখী কেহ দুঃখী কেহ ধনী কেহ দরিদ্র এরূপ বৈচিত্র হয় কেন? এখানে বলিতে হইবে অদৃষ্টই লোকের সুখ দুঃখাদির বৈষম্যের কারণ। লোকে স্বানুষ্ঠিত পাপ ও পুণ্য-কর্ম্মের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ ও সুখ ভোগ করিতেছে। জাতবালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতেছে, তাহার পূর্ব্বে ইহ জন্মে পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম করে নাই তবে তাহার কেন দুঃখ জন্মে? এখানে অবশ্যই অঙ্গী-কার করিতে হইবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্মসম্ভূত অদৃষ্ট ভূমিষ্ঠ শিশুর সুখ ও দুঃখের কারণ, আর ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট স্বীকার করিলে পূর্ব্বজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই রূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও পর পর জন্ম সিদ্ধ হইবে।

সুখ ও দুঃখের কারণ অদৃষ্ট।

যদি বল ঈশ্বরই জগতের বৈচিত্রের কারণ, তাঁহার ইচ্ছা-নুসারে জগতে এরূপ বিচিত্রতা হইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও ধনী কাহা-কেও দরিদ্র করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা শক্তির ইয়ত্তা কে করিতে পারে? তাহা হইলে উত্তরে বক্তব্য এই—ঈশ্বর কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী সৃষ্টি করিয়া বৈষম্য (২) ও নৈর্ঘৃণ্য (৩) দোষের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার অকারণ অনুগ্রহে কেহ সুখী আর

(১) সাপেক্ষত্বাৎ অনাদিত্বাৎ বৈচিত্র্যাৎ বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ ভুক্তে-রস্তিহেতুরলৌকিকঃ॥ কুসুমাঞ্জলিঃ।

(২) পক্ষপাতিত্ব (৩) নির্দ্দয়তা

তাঁহার অকারণ নিগ্রহে কেহ দুঃখী হইয়াছে। এরূপ পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লুপ্ত হয়।

যদি বল ঈশ্বরের অনন্তশক্তি, তাঁহার শক্তির বিভেদ অনুসারে জগৎকার্য্যের বৈচিত্র হইয়াছে (১) ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি অনুসারে লোকের সুখ ও দুঃখাদির বিভেদ হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই শক্তি ও শক্তিমানের বিভেদ অঙ্গীকার কর। এই শক্তিগুলি শক্তিমান্ (ঈশ্বর) হইতে বিভিন্ন, ঈশ্বর এই শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে সুখ দুঃখাদির বিভেদ ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সকল শক্তি ও সুখ দুঃখাদির পরস্পর হেতু হেতুমদ্ভাব (২) সম্বন্ধ। শক্তি সকলই সুখদুঃখাদির কারণ শক্তিমানের (ঈশ্বরের) তাহাতে কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে বক্তব্য এই—তুমি যাহাকে ঈশ্বরের শক্তি বলিতেছ আমি তাহাকে অদৃষ্ট বলিব। ঈশ্বর লোকের অদৃষ্টের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) বিভেদ অনুসারে সুখ দুঃখাদির বিভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, এরূপ কথা বলিলে ঈশ্বরের কোন দোষ উপস্থিত হয় না এবং পূর্ব্ব জন্ম ও পরজন্ম সিদ্ধ হয়। ভূমিতে যে প্রকার শস্য বপন কর সেই প্রকারের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে। ইহাতে ভূমির কোন অপরাধ নাই, তবে ভূমি ব্যতীত অঙ্কুরের উদ্গম হইবে না। সেইরূপ ঈশ্বর কর্ম্মফলানুসারে প্রত্যেক লোকের পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য কোন দোষেরই আপত্তি হইতে

ঈশ্বর ও অদৃষ্ট।

(১) একস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন।
শক্তিভেদো ন চাভিন্নঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ কুসুমাঞ্জলিঃ।

(২) কার্য্যকারণসম্বন্ধ

পারে না। ঈশ্বর বালকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্য কর্ম্মানুসারে তাহার সুখ ও দুঃখের বিধান করিতেছেন, তাহাতে ঈশ্বরের দোষ কি? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ স্বীকার করিলে পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বল শক্তি ও শক্তিমানের কোন বিভেদ নাই, এক ঈশ্বরই জগতের কারণ তাঁহা হইতেই স্বভাবতঃ জগতের বৈচিত্র হইতেছে। তাহা হইলে উত্তর এই—এক কার্য্য উৎপাদন কালে কারণের যে স্বভাব থাকে, কার্য্যান্তর উৎপাদন কালে কারণের সে স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুখ বিধান কালে ঈশ্বরের যে স্বভাব থাকে দুঃখবিধান কালে তাঁহার সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় কেন? আর যদি কারণের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত তাহা হইলে বহ্নি ও জল হইতে পারিত।

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম স্বীকারে যুক্তি।

যদি বল ঈশ্বর লোকের পাপ ও পুণ্য অনুসারে দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করেন বটে কিন্তু সেই পাপ ও পুণ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নহে, বর্ত্তমান জন্মের পাপ ও পুণ্য কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর সুখ ও দুঃখ বিধান করেন। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই—ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু সুখ ও দুঃখ অনুভব করে কেন? সে তখনও কোন পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই তবে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছে কেন? কারণব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। পাপ ও পুণ্য কারণের পূর্ব্বে সুখ দুঃখাদি কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন তাহার পূর্ব্বেই সুখ হইতেছে ও যাহার প্রতি

অপ্রসন্ন হইবেন তাহার পূর্ব্বেই দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে একথা ও বলিতে পার না, তাহা হইলে যে শিশু এখন ও কোন পুণ্যকার্য্য করে নাই তাহাকে সুখ প্রদান করিয়া এবং যে এখনও কোন পাপ কর্ম্ম করে নাই তাহাকে দুঃখ প্রদান করিয়া ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে ঈশ্বর শিশুর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে তাহার সুখ ও দুঃখের বিধান করিতেছেন।

যদি বল ঈশ্বর কোন কারণসাপেক্ষ হইয়া লোকের ইহ-কালের ও পরকালের সুখ দুঃখের ব্যবস্থা করেন, ইহা না হয় অগত্যা স্বীকার করা গেল কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই কারণ তাহা কে বলিল, বিদ্যা ধন ইহার মধ্যে কোন একটী সেই কারণ হইবে, ইহজন্মে যে বিদ্বান্ ও ধনী ছিল পরজন্মে সে সুখী হইবে। ইহার উত্তর এই যে যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম পরকালের হেতু না হইত তাহা হইলে বিশ্বের লোকের ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না। জগতের প্রত্যেক লোকেই ইহকালে ও পরকালে সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে অন্ততঃ ধর্ম্মকে সেবা করা উচিত বলিয়া মনে করে।

যদি বল কতকগুলি লোক প্রথমে অকস্মাৎ কোন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে পরে অপর লোককেও ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। এইরূপে কার্য্য বিশেষে সমাজের অভ্যাস হইয়া যায়। সমাজের এই অভ্যস্ত কর্ম্মই পরে ধর্ম্ম আখ্যা-লাভ করে ও তদ্বিপরীত কার্য্য অধর্ম্ম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তর এই লোকের একরূপ অভ্যাস প্রথমে কেন হয়? জগতের সমস্ত লোকেরই একরূপ কার্য্য হওয়া

সম্ভব নহে, যদি বল ঐ অভ্যাস অকস্মাৎ হইয়াছে তাহা হইলে বক্তব্য এই যে অকস্মাতের মধ্যে এত সুশৃঙ্খলা রহিয়াছে তাহা নিয়মেরই নামান্তর মাত্র। বস্তুতঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তি ইহ জন্মে সমাজের মতৈক্যের কারণ।

যদি বল জগতের আস্তিক লোকেরা পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি মিথ্যা বিষয়ের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সেই মিথ্যা বিষয়ের স্বয়ংও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, (১) ইহার উত্তর এই—এমন অসামান্য লোক কে আছেন যিনি কেবল পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত মিথ্যা বিষয়ের কল্পনা করেন এবং স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে নানাবিধ ক্লেশে অবসন্ন করেন। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের হেতু ইহা সিদ্ধ হইল। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জনিত সংস্কার আত্মায় বিদ্যমান থাকে এবং উপযুক্ত স্থানে সেই সংস্কার অনুসারে আত্মার সহিত বিভিন্ন প্রকার ভোগ্যবস্তুর সম্বন্ধ ঘটে।

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মসমূহ সংস্কার রূপে আত্মায় বিদ্যমান থাকে।

যদি বল পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম পরকালের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হেতু, তজ্জনিত সংস্কার স্বীকার অপ্রয়োজন তাহা হইলে উত্তর এই ফলপ্রসবকালে কারণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে পরোপকার করিয়াছিলাম বিশ বৎসর পূর্ব্বে এখন তাহার ফল কিরূপে জন্মিবে? বলিতে হইবে ফলপ্রসব কালেও কারণ বিদ্যমান আছে, পরোপকার কর্ম্ম সংস্কার (২) ব্যতীত অন্য কোন্

(১) বিফলা বিশ্ববৃত্তির্ন দুঃখৈকফলাপিবা।
দৃষ্টলাভফলা নাপি বিপ্রলম্ভোঽপিনেদৃশঃ॥ কুসুমাঞ্জলিঃ।

(২) চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।
সম্ভোগোনির্ব্বিশেষাণাং ন ভূতৈঃ সংস্কৃতৈরপি॥ কুসুমাঞ্জলিঃ।

রূপে ফল প্রসবকালে আত্মায় বিদ্যমান থাকিতে পারে? আর পূর্ব্ব সংস্কার না থাকিলে শরীরাদি আত্মার ভোগজনক হইত না। সংসারে আত্মাও অসংখ্য শরীরও অসংখ্য অথচ বিশেষশরীর দ্বারা বিশেষ আত্মার ভোগ সাধন হইয়া থাকে। পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম জনিত সংস্কারই আত্মা ও দেহ বিশেষের সংযোগের কারণ। গর্ভমধ্যে জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম ও পূর্ব্বজগৎ স্মরণ করিয়া থাকে ক্রমে দেহাবরণে আবৃত হয় ও দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে অমনি তাহার পূর্ব্বজ্ঞান লুপ্ত হয়।

যদি বল এই পৃথিবীতে একজন জীবন ত্যাগ করিয়া বহুদূর-স্থিত চন্দ্রাদিলোকে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। ইহার উত্তর এই আত্মা বিশ্বব্যাপক, সংসারে এমন কোন স্থান নাই যেখানে তাঁহার ব্যাপিত্ব নাই। তিনি কেবল মোহাচ্ছন্ন হইয়া সামান্য জড় দেহকে আমি বলিয়া আশ্রয় করেন। মোহবশতঃ অনন্ত হইয়াও সান্ত হইয়া পড়েন। তিনি পরমমহান্ হইলেও তাঁহার জ্ঞান জড়চক্ষুর আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

নব্যন্যায়ের যুক্তিসমূহের মর্ম্মার্থ।

তার্কিকের যুক্তিসমূহের মর্ম্মার্থ এই, কেবল ঈশ্বরই জগতের বৈচিত্রের কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মের সুখ ও দুঃখের কারণ নহে এরূপ কথা বলিলে বিশ্বপতির শাসনে দোষারোপ করা হয়। অতএব ঈশ্বর কোন কারণসাপেক্ষ হইয়া সুখ ও দুঃখের বৈষম্যের বিধান করেন। সেই কারণই অদৃষ্ট বা কর্ম্মসংস্কার। জীব পুণ্যও পাপ নামক কর্ম্ম রাশির অনুষ্ঠান করিলে তজ্জনিত যে সংস্কার আত্মায় বিদ্যমান থাকে তাহা যথাক্রমে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট বা সামান্যতঃ অদৃষ্ট নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাকে কর্ম্মশরীরও বলা যাইতে পারে, কেননা আত্মা ঐ সংস্কাররূপ আবরণে আবৃত থাকেন এবং ইহাকে কেহ কেহ কারণশরীর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে হেতু ইহা এই স্থূল দেহের উৎপত্তির কারণ। প্রত্যেক প্রাণী অদৃষ্ট—বশতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ করে এবং এই ফলভোগ কালে পুনরায় যে কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করে তদ্দ্বারা পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই জন্মেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। (১)

এইরূপে কর্ম্মবশতঃ জন্ম ও জন্মবশতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে। যদি বল, কর্ম্ম ও জন্ম এরূপ পরস্পর সাপেক্ষ হইলে সর্ব্বপ্রথম জন্ম বা কর্ম্মের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে ইহার উত্তর এই—যখন সংসার অনাদি, তখন ইহার সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম বা জন্ম কোন ক্রমেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

জন্মান্তরের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ।

শ্রুতিতে ও বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে লোকের জন্মান্তরে বিভিন্ন গতি হইয়া থাকে ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, "হে গৌতম! মৃত্যুর পর আত্মার কিরূপ গতি হয় সেই গুহ্য সনাতন তত্ত্ব আমি তোমাকে বলিতেছি। কোন কোন আত্মা শরীর ধারণের নিমিত্ত স্ত্রীর যোনি প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ বা স্থাণুকে আশ্রয় করে।" (২)

---

(১) "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইতি শ্রুতিঃ।
শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।

(২) হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথাচ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥

উক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মও ছিল এবং পর পর জন্মও আছে, পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম সেই পরলোকের নিয়ামক। পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীব স্বর্গাদি লোকে জন্মগ্রহণ করতঃ সুখভোগ করে, আত্মা এইরূপে অদৃষ্টের অধীন হইয়া নানাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং যতদিন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন তাঁহাকে আরও কত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীবাত্মার মুক্তিতত্ত্ব।

সংসার, দুঃখ ও মুক্তি।

পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির নাম প্রেত্যভাব। প্রেত্যভাবের সহজ অর্থ মরণানন্তর জন্ম গ্রহণ করা। (১) দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধকে জন্ম কহে এবং সেই সম্বন্ধের অভাবকে মৃত্যু বলে। উক্ত জন্ম-মরণ-প্রবাহরূপ প্রেত্যভাবকে আত্মার সংসার কহে। এই সংসার অনাদি এবং আত্মার মোক্ষ পর্য্যন্ত ইহার অন্ত হয় না। দেহের আশ্রয় ব্যতীত আত্মা স্বীয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করিতে অসমর্থ এই হেতু প্রত্যেক আত্মা স্বীয় অদৃষ্টানুযায়ী প্রাণিশরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। পরিগৃহীত দেহের সাহায্যে পূর্ব্ব সঞ্চিত কিয়ৎ

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ কঠোপনিষৎ।

(১) প্রেত্য মৃত্বা, ভাবঃ উৎপত্তিঃ।

কর্ম্মের ক্ষয় ও নূতন কর্ম্মরাশির সঞ্চয় হইলে আত্মা সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন। এইরূপে মনুষ্য পশু বৃক্ষ ইত্যাদি প্রাণিদেহ সমূহের অবিরত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রবাহ অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইতেছে। কোন্ সময় হইতে এই জন্ম প্রবাহের আরম্ভ হইয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া মানব বুদ্ধির অসাধ্য। (১)

বুদ্ধি আত্মার একটা গুণ। ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধিকে মোহ বলে।

সুখ ও দুঃখের উৎপত্তির ক্রম।

এই মোহ হইতে শারীরিক বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের আরম্ভ হয়। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সুখ দুঃখ সংবেদনই সংসারের ফল। আত্মা প্রতি জন্মে অসংখ্য কর্ম্ম রাশি সঞ্চয় করতঃ তজ্জনিত সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। এই সুখ ও দুঃখ বহু প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু অনিষ্টসংযোগ ইষ্টবিয়োগ ও প্রার্থিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে অনেকবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়। (২)

দুঃখ চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থমাত্রেরই প্রতিকূল। দুঃখ পরিহার

---

(১) "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় যে বিধাতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সূর্য্য চন্দ্রাদিকে সৃষ্টি করিলেন। সংসারের অনাদিত্ব নিবন্ধন শ্রুতিতে পূর্ব্বতম কল্প নির্দ্ধারিত হয় নাই। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় ও সংসার অনাদি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

নরূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে।
নান্তোনচাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা॥ (গীতা ১৫।৩)

এই সংসারবৃক্ষের রূপ পরিলক্ষিত হয় না। ইহার আদি নাই অন্ত নাই (আত্মার মোক্ষ পর্য্যন্ত) এবং ইহা কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় না।

(২) বাধনা পীড়া বা তাপের সংশ্রবকে দুঃখ বলে। যখন আত্মার কোন ইচ্ছার

পূর্ব্বক সুখলাভ করা প্রাণিমাত্রেরই অভিপ্রেত। কিন্তু এই সংসারে দুঃখের ভাগ অত্যন্ত অধিক ও সুখের ভাগ অত্যন্ত অল্প। যদিও ইষ্টসংযোগাদি জনিত কিঞ্চিৎ সুখ কখনও উপলব্ধ হয় কিন্তু পরিণামে সেই সুখ দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারা দুঃখাসম্ভিন্ন সুখপ্রাপ্তির আশা করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। নিবিড় তিমির পুঞ্জের মধ্যে একটী খদ্যোত আলোকের ন্যায় এই অনাদি সংসারে অশেষ দুঃখ রাশির মধ্যে সামান্য সুখ কণিকাকে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এই সংসারে আত্মার ইচ্ছা সর্ব্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইতেছে।

মুক্তির প্রয়োজনীয়তা, উপায় ও লক্ষণ।

এই হেতু কোন দার্শনিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই দুঃখ আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক সংসারকে তাপক ও জীবকে তপ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীব ও সংসারের পরস্পর তপ্যতাপক সম্বন্ধ। এই তাপক সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করা জীব মাত্রেরই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু জীব যতকাল পর্য্যন্ত পুণ্য ও পাপনামক কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে ততকাল পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই ইহার মুক্তি হইতে পারে না। "যতকাল

বাধা উপস্থিত হয় তখন সেই বাধিত অবস্থাকে দুঃখ বলা যায়। আর আত্মার ইচ্ছা যখন অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় তখন সেই অবাধিত অবস্থাকে সুখ বলা যায়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, স্পার্শন ও মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয় ও শরীর ইহারা সকলেই দুঃখের সম্পাদক এবং এই সকল না থাকিলে কদাচ আত্মার দুঃখ উৎপন্ন হইত না। অতএব চক্ষু কর্ণাদি সকলেই গৌণ দুঃখ নামে অভিহিত।

পর্য্যন্ত শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় না হয় ততকাল পর্য্যন্ত শত শত দেহ ধারণ করিলেও মনুষ্যের মুক্তি হয় না। লৌহময় ও স্বর্ণ-ময় পাশ দ্বারা জীব যেরূপ বদ্ধ হয়, শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারাও তদ্রূপ আবদ্ধ হইয়া থাকে। শত শত কষ্ট সহ্য করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম সম্পাদন করিলেও যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপ বিনষ্ট ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রাজ্ঞলোকেরা পদার্থ সমূহের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন।"

ঐহিক ও জন্মান্তরীয় বিশেষ সুকৃতি বলে দ্রব্যগুণ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিবহের পরস্পর সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের প্রকৃত বোধ জন্মে। ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দেহাদিতে আত্মার অভেদ বিষ-য়ক মোহ বিদূরিত হয়। মোহ দূরীভূত হইলে ইচ্ছা ও দ্বেষের অপায় হয় ও তদনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া জন্মের উচ্ছেদ ও তাপত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ (১) ও মিথ্যাজ্ঞানের ব্যুৎক্রমে উত্তরোত্তর অপায়ে অপবর্গ লাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (২)

দুঃখকর জন্মের অত্যন্ত বিমুক্তি এবং বাহ্যবস্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার যে অনির্ব্বচনীয় বন্ধন আছে সেই বন্ধনের উচ্ছেদের নামই মুক্তি।

---

(১) ইচ্ছা দ্বেষ ও মোহ।

(২) দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানাং উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়া-দপবর্গ ইতি গৌতমসূত্রম্।

মুক্তাবস্থায় দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আত্মা তখন বুঝিতে পারেন তিনি দেহ নহেন এবং দেহের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিহীন আত্মাকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। (৩)

সংসার ও মুক্তি পথের ভেদ।

যাঁহারা এরূপ মুক্তিপদের প্রার্থী নন এবং দৈহিক সুখ নিচয়ের অভিলাষী, তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন তাহা হইলে জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া অভীষ্ট সুখলাভে সমর্থ হইবেন। সংসার ও মুক্তি দুই পথ বিদ্যমান আছে, যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন কর। চিরশান্তি পরম পাবিত্র ও দুঃখের অত্যন্ত ধ্বংস ইচ্ছা কর, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ পদের প্রার্থী হও। বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া কখন ও সুখ, কখন ও দুঃখ, কখন ও মিলন, কখন ও বিরহ ইত্যাদি যদি কামনা কর, সংসারমার্গ অবলম্বন কর। জন্ম, জরা, মরণ, ব্যাধি প্রভৃতি এই মার্গের অবশ্যম্ভাবী ফল। উভয় মার্গে কৃতকার্য্য হইতে হইলেই ধর্ম্মের প্রয়োজন। পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তিলাভ করিবে। আর যদি জন্ম জন্মান্তরে বহু সুখলাভ করিতে চাও তাহা হইলেও ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর ধর্ম্মের পরিণামই সুখ।

---

(৩) অশরীরং বাবসন্তং ন স্পৃশতঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ইতি শ্রুতিঃ।
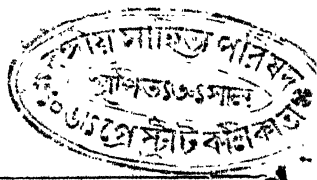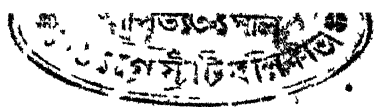
উপসংহার।

যদি কেহ মনে ভাবে, জগতের কর্ত্তা অথবা আত্মা বলিয়া কিছু নাই। যতদিন আমি এই পৃথিবীতে আহার, বিহার ক্রীড়া কৌতুক করিব, ততদিনই আমার,—ইহার পর আমার ভৌতিক দেহ ভূতে মিশিয়া যাইবে, "আমি" বলিয়া জগতে আর কিছুই থাকিবে না, আমি জীবের প্রতি দয়াই করি, আর হিংসাই করি, সত্য কথাই বলি অথবা শঠতা প্রবঞ্চনাই করি, ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহই করি কিম্বা অবাধ পরিচালনা করি, দানই করি আর ঋণ করিয়াই ঘৃত ভোজন করি, আমার কৃতকর্ম্মের জন্য আমি দায়ী নহি, আমার কার্য্যের পুরস্কর্ত্তা বা দণ্ডবিধাতা কেহ নাই, তাহাহইলে এই জীবন কিরূপ নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, নিরাশা আসিয়া কি প্রকারে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে? বস্তুতঃ নাস্তিকের জীবন ভীষণ যন্ত্রণাময়। অনেক তার্কিক প্রথমে ঈশ্বরের ও আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন শেষে জীবনাবসানসময়ে পরলোকের ভয়াবহ ভাব স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বসঞ্চিত যুক্তিরাশি বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি এ জগতে কেহই ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করে, সকলেই পাপ পুণ্যকে অলীক কল্পনাসম্ভূত মনে ভাবে তাহা হইলে বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কার্য্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রের অনুশাসন অথবা বিধিবন্ধন মিথ্যা জানিয়া কেহই তাহাতে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না। মানবসমাজ উশৃঙ্খল হওয়ায় পৃথিবী এক অভিনব ভীষণতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অধোগতির নিম্নতম সীমায় নীত হয়! ঈশ্বর কিংবা দেহাতিরিক্ত জীবাত্মা নাই ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় এক প্রকার নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হয়।